সতু বদ্যির রোজনামচা

সতু বদ্যির রোজনামচা

সতুবদ্যির রোজনামচা

॥ সতুবদ্যি ॥

নতুন সাহিত্য ভবন
কলিকাতা-২০

॥ ভূমিকা ॥

সতু বদ্যি সত্যিই জাত বদ্যি। খুব প্রাচীন কবিরাজ বংশের ছেলে। সে নিজে অবিশ্যি মেডিকাল কলেজ থেকে আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষা নিয়েছে। তার বাবা আর ঠাকুর্দাও তাই। তবে তার আগে তাদের বংশটা কবিরাজ বংশই ছিল।

সতু বদ্যি নিজে চিকিৎসা ব্যবসায় করে শহর আর শহরতলী মেশানো এলাকায়। রোগী তার প্রচুর। তার রোগী সেরেছে অনেক, মরেছেও কম নয়। উদয়াস্ত সে রোগী নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

সতু বদ্যিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা বাপু তুমি ডাক্তারী করে দিব্যি তো রোজগারপাতি করে খাচ্ছ। কিন্তু তাঁতির এঁড়ে গোরু কেনার মত তুমি আবার কাগজ-কলম নিয়ে পড়লে কেন।'

তার উত্তরে সতু বদ্যি যা বলেছিল মোটামুটি তাইই এখানে বলছি।

সতু বদ্যি নাকি যখন মেডিকাল কলেজে ঢুকেছিল তখন তার বাবা তাকে বলেছিলেন—'রুগী যদি সতু বদ্যির দোষে সতু বদ্যির দোর থেকে কখনো ফিরে না যায় তাহলে সতু বদ্যির কিংবা তার স্ত্রী-পুত্রের কখনো ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।'

সতু বদ্যি তাইতে সব সময়ই চেষ্টা করে রোগী না ফেরাতে, এমন কি মজুরি না পেলেও।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সতু বদ্যি মাঝে মাঝে এমন প্যাঁচালো পরিস্থিতিতে পড়ে যে তখন তার কখনো হয়তো ইচ্ছে হয় পাড়া মাতিয়ে কাঁদতে আবার কখনো হয়তো মনে হয় ছেলেবেলার মত মায়ের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে নালিশ করতে।

কান্না হল সতু বদ্যির ব্যর্থতার কান্না, আর নালিশ? কত ভালো করে গুছিয়ে সতু বদ্যি ও আর সব জাত বদ্যিরা মানুষের স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে পারত অথচ তারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে—তার জন্যে নালিশ।

কার কাছে এই কান্না আর নালিশ?

কেন? ছেলেবেলার মতই সতু বদ্যি নালিশ করছে তার মায়ের কাছেই, মা অর্থাৎ তার দেশের লোক। তাঁরাই তো সতু বদ্যি আর সব জাত বদ্যিকে জন্ম দিয়েছেন, পালন করেছেন।

আর শুধু কি তাই ? ছেলেবেলায় সতু বক্সির মায়ের সংসারে মা যেমন ছিলেন—সতু বক্সির দেশের লোকও তো তেমনি। অসীম তাঁদের ক্ষমতা। তাদের সবার ইচ্ছে এক হলে তাঁরা নিশ্চয়ই পারেন সতু বক্সিদের সবাইকে সুযোগ দিতে সুন্দরতর সুস্থতর জাতি গড়ে তুলতে।

রোজনামচা নাকি সতু বক্সির ওই কান্না আর নালিশ একসঙ্গে মিশিয়ে হয়েছে।

সতু বক্সির কোন পুরুষেই কেউ কিন্তু এ রকম নালিশ করতে গিয়েছিল বলে জানা যায় না। তাহলে সতু বক্সিই বা কেন করতে গেল ?

এ প্রশ্নের উত্তরে সতু বক্সি একেবারে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উৎপত্তি নিয়ে শুরু করে।

দেবাদিদেব মহাদেব নাকি পুরাকালে একবার পৃথিবীতে এসেছিলেন। তখন তিনি মর জগতের আধি ব্যাধি দেখে সহানুভূতিতে একেবারেই ভিজে গেলেন। সেই সময় তিনি সতু বক্সির এক পূর্বপুরুষকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র দান করে যান।

দান করে মহাদেব খুব খুশি মনে কৈলাসে ফিরে গিয়ে নেশার ঝোঁকে পার্বতীকে খবরটা দিয়ে দিলেন। একটা বিরাট কিছু করে এসেছেন তো যাই হোক।

শুনেই তো পার্বতী একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। আচ্ছা, মানুষ যদি জরা-ব্যাধিতে না মরবে তাহলে তো পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে খাদ্যাভাবেই মানুষকে শেষ পর্যন্ত মরতে হবে। (এইখানে সতু বক্সি আবার মনে করিয়ে দিল যে, সে হিসাবে অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস আসলে পার্বতীর প্রাপ্য গৌরব চুরি করেছেন। বিশ্বাস না হয় ম্যালথাসের জন্ম তারিখ আর পার্বতীর জন্মতারিখ মিলিয়ে দেখুন।)

তখন মহাদেবের চৈতন্য হল। তাই তো নেশার ঘোরে বড্ড কাঁচা কাজ হয়ে গিয়েছে। তখন অনেক ভেবে চিন্তে মহাদেব বললেন—'ঠিক হয়েছে, পার্বতী। ব্রহ্মা যখন মৃত্যু লিখে দেবেন তখন সব বৈদ্যেরই ভুল হবে, বুদ্ধি গুলিয়ে যাবে। আর তাতেই মানুষ মরবে।'

তাইতে সতু বক্সির পূর্বপুরুষরা রুগী মরে গেলে বিধাতা পুরুষ আর হর-পার্বতীর উপরে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত। সুতরাং নালিশ, পুলিস কান্নাকাটির দরকার কি ?

কিন্তু এখন এমন সব গোলমেলে কাণ্ড হচ্ছে যে বিধাতা পুরুষ ও হর-পার্বতীর উপর দোষ চাপালে আর ঠিক মিল খাচ্ছে না।

মহাদেব এখন আর ধরাধামে আসেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বাড়ছে আর বদলাচ্ছে। আর পার্বতী আর তার মানসপুত্র ম্যালথাসকে কলা দেখিয়ে মানুষের বংশও বেড়ে চলেছে। আর শুধু কি তাই? সংখ্যায় তো বটেই—তাছাড়াও আহারে, বিহারে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, স্বাস্থ্যে, আরোগ্যে সর্ববিষয়েই মানুষ এগিয়ে চলেছে। দুনিয়ার অনেক দেশের লোক—কোটি কোটি মানুষ যোগ দিয়েছে এই চলার মিছিলে। কিন্তু সতু বস্থির নিজের দেশের লোক খালি ঠোক্কর খাচ্ছে অচলায়তন প্রাচীরে।

অবশ্য পার্বতী যে হেরে গেলেন তার জন্যে তাঁকে খুব দোষ দেয়া যায় না। কারণ এই আগে চলাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যে মানুষের নতুন বেদ—বিজ্ঞান, তা তো আর পার্বতী জানতেন না।

তাইতে সতু বস্থি তার নালিশ, পুলিস আর কান্নাকাটি যা আছে সব তার দেশের লোকের দুয়োরেই হাজির করল।

কারণ আসলে তো তাঁরাই সতু বস্থির জন্মদাতা বিধাতা।

এই হল সতু বস্থির রোজনামচার সৃষ্টিতত্ত্ব।

সতু বস্তির সেই সব জীবন্ত রোগীরা যারা মরে মরেও সতু বস্তিকে জীবন ও মনুষ্যত্ব চিনিয়েছে সতু বস্তি তার এই কান্না আর নালিশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাদের হাতেই তুলে দিচ্ছে।

স্কচ হুইস্কি ও পেনিসিলিন

গাড়িটা খুব বড় নয়, কিন্তু বেশ কায়দাদুরস্ত। লম্বাটে ধরনের—হুডটা গোটানো। মেয়েদের বগলকাটা জামার মত দু-পাশটা নীচুভাবে কাটা। একেই বোধ হয় রেসিং কার বলে। গাড়ি থেকে নেমে ভদ্রলোক স্লিপ দিলেন সতু বক্সির বেয়ারাকে—'তোমার সাহেবকে বলো একটু তাড়াতাড়ি আছে।'

যথাসময়ে ডাক্তারবাবুর খাস্ কামরায় ডাক পড়ল। খাতা খুলে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে ?'

ভদ্রলোকের শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। কয়েকদিন আগে একটা ডিনার পার্টিতে নেমন্তন্ন ছিল। শুধু খাদ্যই নয়, ভালো পানীয়ের বন্দোবস্তও ছিল। আহার বেশী না হলেও পান একটু বেশীই হয়েছিল। সামান্য একটু বে-সামালও হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হোটেলেরই একটা ঘরে রাত কাটাতে হয়। সকালে উঠে দেখলেন তাঁর বিছানায় অসংবৃত পোশাকে একটি অপরিচিতা মহিলাও শুয়ে আছেন। অবিশ্যি রাত্রিবেলায় নেশার ঘোরে কি করেছেন সবটা মনে নেই। কিন্তু আজ দুপুরবেলা থেকে শরীরটা খারাপ হয়েছে। আর তাছাড়া প্রস্রাবে বেশ জ্বালা। আধুনিক ভদ্রলোক ডাক্তারকে কিছু লুকিয়ে রাখা পছন্দ করেন না।

কাঁচের শ্লাইডে পুঁজ নেবার কোন দরকার ছিল না। ইতিহাস আর রুগ্ন অঙ্গের চেহারাতেই অসুখের পরিচয় পাওয়া যায়। রোগ নির্ণয়ের পক্ষে তাইই যথেষ্ট। তবুও নিতে হবে। তাছাড়া রক্তও নেয়া দরকার। এ তো গণোরিয়া, যদি সিফিলিসের বিষ থাকে !

এ-গুলো সতু বক্সি করে অনেকটা অভ্যাসের বশে। সে জানে, ভদ্রলোকের যন্ত্রণা সেরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক আবার পার্টিতে যাবেন। সুতরাং একদম সারিয়ে দেয়া, পাকাপাকি সারিয়ে দেয়া, জন্মের মত সারিয়ে দেয়া—এ সব কথার কোন অর্থ নেই। তবে অভ্যাসের বশে করতেই হয়। তাছাড়া সতু বক্সির বেশ পয়সাও আসে এ সব থেকে।

রক্ত নেয়া, স্লাইড নেয়া, ইঞ্জেক্শন দেয়া, ওষুধ দেয়া সব হয়ে গেলে ভদ্রলোক মৃদু হেসে প্যাণ্টের বোতাম দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেন, 'এক্সকিউজ মি ডক্টর, আপনার প্রাপ্যটা ?'

হিসেব করে সতু বদ্যি বলে, 'একশো ছ-টাকা।'

চামড়ার মনিব্যাগ থেকে ভদ্রলোক টাকা বার করেন। একটা খোপ থেকে একটা একশো টাকার নোট, আর একটা খোপ থেকে একটা দশ টাকার নোট। সতু বদ্যি চার টাকা ফেরত দিতে যেতেই ভদ্রলোক 'দ্যাট্স্ অল রাইট ডক্টর' বলে বেরিয়ে যান দরজা ঠেলে ফেরত টাকা না নিয়েই। আবার কাল আসবেন।

এবার সতু বদ্যির দরজা ঠেলে ঢোকে নোংরা কাপড় পরা একটি লোক। দেখে সতু বদ্যি চিনতে পারে। ওদের বাড়ির পিছনের বাড়িটাতে এ থাকে।

'একবার আপনাকে যেতে হবে ডাক্তারবাবু'—লোকটি মিনতি করে।

'কী ব্যাপার ?' সতু বদ্যির চোখে প্রশ্ন জেগে ওঠে।

সেই বিরিঞ্চি দাস ? ওই যে বস্তিতে জবরী আহীরের খাটালের পাশে থাকে ? ওই যে খুব রোগা ? কয়েক মাস আগে সতু বদ্যির কাছে এসেছিল ? তার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে—তাজা রক্ত। অনেক রক্ত। রোগা লোক তো ? বেশী রক্ত উঠলে সব রক্তই ফুরিয়ে যাবে। লোকটি মিনতিতে নুয়ে পড়ে। সতু বদ্যি কিন্তু লোকটিকে চিনতে পারে না—বিরিঞ্চি দাসের নাম শুনেছে বলে মনেও পড়ে না। যাই হোক, জরুরী ডাক যখন, যেতেই হবে।

বস্তির ঘরটার বড়ই দুরবস্থা। কিন্তু ভিতরের সাজপোশাকে কি রকম বেমানান ধরনের সব গরমিল। বিছানায় চাদরের বদলে নোংরা ছেঁড়া ধুতি পাতা অথচ ভাঙা তক্তাপোশের নীচে হাই-হীল জুতো, বসতে দেবার জল-চৌকিটা ভাঙা নড়বড়ে। সতু বদ্যির দু-মন দশ সের ওজনের ভারে ভেঙেই পড়বে বলে ভয় হয়। অথচ দেয়ালের কুলুঙ্গিতে আছে মুখে মাখবার পাউডার আর গায়ে মাখবার পাউডার, ঠোঁটে লাগাবার রঙ আর নখে লাগাবার রঙ। এ গোলমালটা সতু বদ্যির নজরেও পড়ত না। সতু বদ্যি হল আসল জাত বদ্যি। ছুতোর মিস্ত্রীকে চেয়ারের পায়া মেরামত করতে দেখেছেন ? সতু বদ্যি যখন মানুষের অঙ্গ মেরামত করে তখন তার মনের সঙ্গে ওই ছুতোর মিস্ত্রীর মনের বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না।

কিন্তু ব্যাপারটা হল গন্ধ নিয়ে। এই যে রোগা, ফ্যাকাশে, ঘাটের মড়ার মত চেহারা, কাশির সঙ্গে ঝলকে ঝলকে রক্ত তুলছে, ওর সবই সতু বদ্যির চেনা। ওর বুকের জিরজিরে হাড়ও চেনা, ওর রক্তের টকটকে লাল রঙও চেনা, ওর রক্তের বজবজে ফেনাও চেনা—হাপরের মত নিশ্বাসও চেনা, আবার ফড়িঙের মত প্যাকাটি হাত-পাও চেনা। চেনা নয় শুধু দুটো জিনিস। ওর ওই বিরিঞ্চি নামটা আর—আর—একটা গন্ধ। কি রকম একটা পরিচিত গন্ধ—যা রোগীর সঙ্গে ঠিক মানায় না। নাম বিরিঞ্চিই হোক আর ঘটোৎকচই হোক, সতু বদ্যির তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ওই গন্ধ?

সুতরাং সতু বদ্যি লেগে যায় গন্ধ বিচারে।

ওই যে ছ-সাত মাস আগে সতু বদ্যির কাছে গিয়েছিল বিরিঞ্চি, তখনই ওর প্রথম রক্ত পড়ে। তখন বিরিঞ্চি চাকরি করত লোহা কারখানায়, সতু বদ্যি ওর রক্ত দেখেছিল আর ছবিও তুলেছিল। কিন্তু চিকিৎসার যা ফর্দ দিয়েছিল তা ওর পক্ষে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। বস্তির লোকে বুদ্ধি দিল বুড়ো শিবতলার কাছে যে জাগ্রত কালী ঠাকুর আছেন তার কাছে যদি কেউ হত্যা দেয় তবে ওষুধও পেতে পারে, সারতেও পারে। কালী ঠাকুর খুব জাগ্রত দেবতা। বিরিঞ্চির বউ সেখানে গিয়ে হত্যাও দেয় চার-পাঁচ দিন। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, না অন্ন, না জল দিবারাত্রি শুধু কালী ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা, শেষে এক রাত্রিবেলা কালী ঠাকুর প্রত্যাদেশ করলেন—

'বুড়ো শিবতলার বটগাছের ঝুরি থেকে একটু কেটে নিয়ে যা। রোজ সকালে উঠে বাসি কাপড় ছেড়ে, খালি পেটে, ওই শিকড় ধোয়া জল তোর স্বামীকে একটু একটু করে খাওয়াবি।'

এদিকে কিন্তু বিরিঞ্চির চাকরিও গেল। শিকড় ধোয়া জলের সঙ্গে সামান্য সঞ্চয়ও ফুরিয়ে গেল।

মহামুশ্‌কিল, তখন বিরিঞ্চির বউ চাকরি পেল একটা।

'কত মাইনে?'

'একশো পঁচিশ টাকা।'

'মাসিক? কোথায়?'

'মাসাজ বাথ,' বলতে গিয়ে লজ্জায় নুয়ে পড়ে মেয়েটি।

তার পরেরটা অবশ্য খুবই সরল, ঘরের সাজপোশাক আর আসবাবের গরমিল, আর গন্ধের গরমিল, দুটোরই মীমাংসা হয়ে যায়।

ওই আসবাব মেয়েটির মাসাজ বাথে চাকরির আসবাব। আর গন্ধ হল মেয়েটির কাছ থেকে ছেলেটি যে সিফিলিস রোগ পেয়েছে তার গন্ধ।
পরীক্ষা করে আরও বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। বিরিঞ্চি দাসের ঊর্ধ্ব-অঙ্গ খাচ্ছেন যক্ষ্মাবীজাণু আর নিম্ন-অঙ্গ খাচ্ছেন সিফিলিসের বীজাণু। বুকের ভিতরটা তো আর খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। তবে নিম্ন-অঙ্গের কাপড় তুললেই দেখা যায়। যে ব্রণ মক্ষিকারা ইচ্ছা করেন ঠিক তাই। তবে আকারে বেশ বড়। কয়েক হাজার মক্ষিকার স্থান হতে পারে।
মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখে সতু বদ্যি। তার উঁচু বুকটার দিকে। মেয়েটির শাড়ী ব্লাউজ বডিস ভেদ করে আরও ভিতরে সতু বদ্যির দৃষ্টি যেতে চায়, কিন্তু তা কোন অসদুদ্দেশ্যে নয়! ও তো সেই ছুতোর মিস্ত্রীর দৃষ্টি।
সতু বদ্যি দেখতে চেষ্টা করে বউটি তো তার স্বামীকে সিফিলিস দান করেছে—স্বামী প্রতিদানে ওর বুকে যক্ষ্মা রোগদান করেননি তো?
বিরিঞ্চির ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে হয় তার তিনদিন পরে। ডেথ সার্টি-ফিকেটে রোগ একটা লিখতেই হবে। না লিখলে শ্মশান থেকে মড়া ফিরিয়ে দেবে। অথচ রোগটা সতু বদ্যি কি লেখে? সিফিলিসের বিষাক্ত ঘা না যক্ষ্মাজনিত রক্ত-মোক্ষণ? হাসপাতালের হলে সতু বদ্যি লিখত ডিজিজ জি, ও, কে, (রোগ—গড্ ওন্‌লি নোজ, অর্থাৎ একমাত্র ভগবান জানেন)। কিন্তু এখানে একটা কিছু লিখতে হবে।
অনেক ভেবে শেষে যক্ষ্মা রোগই লিখে দেয় সতু বদ্যি।

তারপর আজকে আসেন সেই মেয়েদের বগলকাটা জামার মত করে পাশকাটা গাড়ি-চড়া সেই ভদ্রলোক। ভদ্রলোক সম্পূর্ণ সেরে গেছেন। ভারী খুশি। সতু বদ্যিকে তার বাকি পাওনা ১৬০৲ টাকার বদলে দুশো টাকা দিয়েই যে ভদ্রলোক শেষ করলেন তাই নয়। ভারী সুন্দর একটা প্যাকেট রাখলেন সতু বদ্যির টেবিলে।
'তিনটি বোতল আছে, ডাক্তারবাবু। সাহেবদের দুটি আবিষ্কার সবচাইতে দামী বুঝলেন। স্কচ হুইস্কি আর পেনিসিলিন। শেষেরটা তো আপনারই অনেক আছে ডাক্তারবাবু—তাইতে প্রথমটা আপনার জন্যে তিন বোতল রইল।'
ভদ্রলোকের নজরই শুধু বড় তাই নয়—কথা বলার ধরনেও যথেষ্ট আভিজাত্য আছে।

আস্তে আস্তে প্যাকেট খোলে সতু বক্সি। প্রথমে ছাপমারা দড়ির বন্ধন। তারপর পাতলা পালিশ কাগজের ঢাকনা, তারপরই বোতল, বাইশ আউন্সের বড় বোতল। ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বোতলের রঙিন জলে আলো পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সতু বক্সির কি রকম সব গুলিয়ে যায়। বোতলের রঙিন জলের ভিতরে সব ছায়াগুলো আলো পড়ে যেন নাচছে। কার ছায়া ? সতু বক্সির ? বিরিঞ্চি দাসের ? বগলকাটা গাড়ি-চড়া বাবুর ? বিরিঞ্চি দাসের মাসাজ বাথে চাকরি করা বউয়ের ? স্যার আলেক-জাণ্ডার ফ্লেমিং-এর ? রবার্ট কক্-এর ?
সব কি রকম তালগোল পাকিয়ে নাচতে থাকে সতু বক্সির সামনে। হুইস্কির বোতলের রঙিন জলে।

কুদঘাটা পেরিয়ে

সতু বক্সি পালাচ্ছে। দৌড়ে পালাচ্ছে। তু-মন দশ সের ওজন নিয়ে থপ্ থপ্ করে দৌড়ে পালাচ্ছে। ভাবতে পারেন দৃশ্যটা? আচ্ছা একটা কোলা ব্যাঙকে দৌড়তে দেখেছেন? মনে মনে সেই দৃশ্যটা কল্পনা করে একটা ছবি আঁকুন। তারপর কল্পনা করুন একটা হাতী দৌড়চ্ছে থপ্ থপ্ করে। মনে মনে তারও একটা ছবি আঁকুন। তারপর দুটো ছবি এক সঙ্গে মেশান। তারপর দুই দিয়ে ভাগ করুন সেই মিলিত ছবিকে।

তাহলেই খানিকটা আঁচ করতে পারবেন সতু বক্সির দৌড়ের দৃশ্য।

কিন্তু সতু বক্সি দৌড়বে কেন? আর এরকমভাবে দৌড়ে পালাবেই বা কেন? সতু বক্সি পাড়ার একটি ডাকসাইটে, মাতব্বর বক্সি। মধুসূদন কবিরাজের বংশধর সতু বক্সি সে পালাবে? আর এইরকম ভাবে ভয় পেয়ে অর্ধেক কোলা ব্যাঙ্ আর অর্ধেক হাতীর মত থপ্ থপ্ করে?

কেন বলুন তো? বাঘে তাড়া করেছে? কিংবা সাপে? না, কলকাতা শহরে সাপই বা কোথায় আর বাঘই বা কোথায়? তাহলে? ডাকাত? না দিনের বেলা ডাকাত আসবে কোথা থেকে? আর এলেই বা সতু বক্সির আছে কি, যে তাকে তাড়া করবে?

তাহলে?

বিশ্বাস করবেন? রুগী তাড়া করেছে, তাও কোন পাগল কিংবা মাতাল কি গুণ্ডা রুগী নয়।

বছর ষোল বয়স—ছিপছিপে শ্যামলা রঙের একটি মেয়ে—সে তাড়া করেছে। আর তাইতে সতু বক্সি পালাচ্ছে তার তু-মন দশ সের ওজন নিয়ে—থপ্ থপ করে পালাচ্ছে।

বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে শুনুন গল্পটা।

ঠিক তারিখটা মনে নেই। তবে বছর আড়াই আগেকার ঘটনা হবে। সতু বক্সির এক অনেক দিনের পুরনো মক্কেল তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কি যেন গোপনীয় পরামর্শ আছে।

বেশ অবস্থাপন্ন ঘর তাছাড়া পরিবারটাও তাদের বেশ বড়। বছরে দু-এক হাজার টাকা তাদের বাড়ি থেকে সতু বদ্যি পায়। তাইতে খাতিরও সতু বদ্যি তাদের যথেষ্ট করে। যাই হোক আসলে তো দোকানদার।

সতু বদ্যির খাসকামরায় এসে গোপন পরামর্শ শুরু হয়।

কলকাতার বাইরে আসামের দিকে ভদ্রলোকের একঘর আত্মীয় আছেন। অবস্থা তাদের খুব সম্পন্ন নয়। তাদের একটি মেয়ে আছে। হয়তো বছর তেরো বয়স হবে। তাকে নিয়েই সমস্যা। গতকাল ভদ্রলোক খবর পেয়েছেন মেয়েটি সন্তানসম্ভবা। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস হবে। কিন্তু মেয়েটি অবিবাহিতা।

আসামের পরিবারটি যদিও খুব সম্পন্ন নয় তবুও পারিবারিক মর্যাদা তাদের যথেষ্ট। তাছাড়া ওরা সতু বদ্যির এই মক্কেল পরিবারটিরও বেশ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

সুতরাং এই সমস্যায় শুধু মেয়েটির ভবিষ্যতই জড়িত তাই নয় বনেদী মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকটি পরিবারের ভবিষ্যতও জড়িত এর সঙ্গে।

ভদ্রলোকের কঠিন সমস্যা। এখন কি উপায় তিনি করতে পারেন?

কেন? যে ছেলেটি এর জন্যে দায়ী তাকে ধরে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন জোর করে।

সতু বদ্যির সোজা সমাধান।

তা সম্ভব নয়। কারণ ছেলেটি যে কে তা বোঝা যাচ্ছে না। ওইটুকুন মেয়ে, এখনও পার্কে-বাগানে খেলা করে বেড়ায়। কিন্তু এর জন্যে কে দায়ী তা সে কিছুতেই বলবে না। মেরে ফেললেও না। মেয়েটির মা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি। তিন দিন মেয়েটিকে না খেতে দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন কিন্তু তবুও তার কাছ থেকে কথা বের করা যায়নি। আর তাছাড়া কথা বার করলেও তো সব সময় সম্ভব হয় না জোর করে বিয়ে দেয়া।

ভদ্রলোক অনেক চিন্তা করেছেন এই ব্যাপার নিয়ে।

তাহলে নিয়ে আসুন কলকাতায় কিংবা অন্য কোন বড় শহরে যেখানে তাকে কেউ চেনে না। তারপর সে থাকুক অন্য কোন অভিভাবকের সঙ্গে। যেন বিবাহিতা মেয়ে, স্বামী বিদেশে থাকেন এইভাবে। তারপর তার সন্তান হোক। সন্তানের বয়স বছরখানেক হলে তখন মেয়েটি

নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি হিসাবে কোন কাজকর্ম শিখতে পারবে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে মাতৃত্বের গৌরবেই তখন নিজে দাঁড়াবে। মাতৃত্ব—এতে তো অগৌরবের কিছু নেই।

সতু বত্মি মিস্ত্রী ক্লাসের লোক তো। তাইতে তার সমাধানগুলোও সাদাসিধে, সোজা সোজা।

কিন্তু তাতেও খুব সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। ভদ্রলোক বুঝিয়ে বলেন। এই দীর্ঘ দিন অনিশ্চিত জীবন নির্বাহ করার মত আর্থিক সঙ্গতি তাদের নেই।

যাই হোক সতু বত্মির সঙ্গে পয়সা খরচ করে দার্শনিক আলোচনা করা ভালোও লাগছিল না ভদ্রলোকের। এইবার তিনি সোজাসুজি কথা পাড়েন।

সতু বত্মির পক্ষে কি সম্ভব এই সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়া? এর জন্যে যা খরচপত্র হবে তা বহন করতে ভদ্রলোক পারবেন। অর্থাৎ একদম সোজাসুজি না হলেও ভদ্রলোক প্রায় বলে দেন—এ রোগের তদ্‌বিরের জন্যে বাজার দর অনুসারে সতু বত্মির যা প্রাপ্য তা দিতে ভদ্রলোক রাজী আছেন।

কিন্তু মানুষ বাঁচাতে চেষ্টা করাই সতু বত্মির পেশা, হত্যা করা নয়; সে সমাগতই হোক আর অনাগতই হোক। স্বাগত কিংবা অনাহূত যাই হোক না কেন। সেজন্যে এ ব্যাপারে সতু বত্মি কোন সাহায্য করতে পারবে না। ঠিক যেমন পারবে না মাছের ব্যবসায়ে কিংবা শেয়ারের বাজারে কোন সহায়তা করতে।

তখন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের অধিপতি মহারাজাধিরাজ হিরণ্য কশিপু। প্রহ্লাদকে হত্যার সাহায্য তিনি চেয়েছিলেন সতু বত্মির পূর্বপুরুষ ধন্বন্তরির কাছে। তার বিনিময়ে তিনি ত্রিভুবনে যা খুশি ধন্বন্তরিকে দিতে রাজী ছিলেন।

কিন্তু ধন্বন্তরি রাজী হননি। কারণ এ কাজ ছিল তাঁর ব্যবসার বাইরে।

আর এ ভদ্রলোক কী আর দেবেন সতু বত্মিকে।

সতু বত্মির এ যুক্তি অকাট্য।

কিন্তু ভদ্রলোকও মূর্খ নন। যথেষ্ট বিদ্বান আর বুদ্ধিমান। তিনি বোঝান। ১৩।১৪ বছর বয়সের অল্পশিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েকে যদি তার

বিয়ের আগে মা হতে বাধ্য করা যায় তাহলে তার ফল কি হবে। সেই মা নিজে হবে সমাজপরিত্যক্তা, হয়তো শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তি ছাড়া তার কোন পথই খোলা থাকবে না। তার ভবিষ্যৎ সন্তানও হবে দরিদ্র, অশিক্ষিত, সমাজপরিত্যক্ত অথচ আজ যদি এই অবস্থা থেকে মেয়েটি মুক্তি পায়, সসম্মানে মুক্তি পায়, তা হলে হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনে সে সাধারণ ভদ্র সভ্য জীবন যাপন করতে পারবে। এমন কি এই শিক্ষায় হয়তো সে সাধারণের চাইতেও উন্নত জীবন যাপন করতে পারবে। তার জীবনের একটা ভুলের জন্যে—হয়তো একদিনের এক মুহূর্তের ভুলের জন্যে—তাকে সারা জীবনের মত অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে বাধ্য করা কি যুক্তিযুক্ত হবে ? আর সেই ভবিষ্যৎ সন্তান ?

তার সম্বন্ধে শাস্ত্রকাররা বলেছেন—"অজাতমৃত মূর্খেভ্য মৃতাজাত স্হতো বরম।" অর্থাৎ কিনা যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি, কিংবা যে সন্তানের জন্মাবার পর মৃত্যু হয়েছে কিংবা যে সন্তান মূর্খ হয়ে বেঁচে আছে, এদের ভিতরে অজাত আর মৃত সন্তানই শ্রেয়। সুতরাং—

সতু বক্সি কিন্তু কোন যুক্তিই অস্বীকার করে না। তবে তার বক্তব্য হল এ তার পেশা নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে সে কোন সাহায্যই করতে পারবে না।

তবে হ্যাঁ এই যদি সমস্যা হয় তা হলে সতু বক্সি ভদ্রলোককে অন্যভাবে সাহায্য করতে পারে। সেই মেয়েটিকে প্রসব পর্যন্ত আর তারপর যতদিন পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হয় ততদিন পর্যন্ত কলকাতার কোন ভালো নার্সিং হোমে গোপনে রাখবার বন্দোবস্ত সে করতে পারে। আর তার যদি জীবিত সন্তান হয় তাহলে তাকে অন্য কোন বাড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করতে পারে। খরচপত্র সবই অবিশ্যি ভদ্রলোককেই বহন করতে হবে। তাহলে সাপও মরল অথচ লাঠিও ভাঙ্‌ল না। আর এ কাজ সতু বক্সির ব্যবসার আওতায়ও পড়ল।

এরকম যে একটা রাস্তা থাকতে পারে তা অবশ্য ভদ্রলোক জানতেন না। আর তাছাড়া সতু বক্সির দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে ভদ্রলোকের বিশ্বাসও অগাধ। সুতরাং সতু বক্সির উপরে দায়িত্বটা ফেলে দিতে পারলে ভদ্রলোকও নিশ্চিন্ত হন।

তবে এত সহজে মত দেওয়া সম্ভব নয়। পরে আবার আসবেন বলে ভদ্রলোক বিদায় নেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভদ্রলোক সতু বক্সির প্রস্তাবেই রাজী হয়েছিলেন আর সতু বক্সিও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল সানন্দেই।
আনন্দের কারণ কি ভদ্রলোকের দেয়া আগাম এক হাজার টাকা? না শুধু তাই নয়, কাজটা সতু বক্সির ব্যবসার আওতায় পড়ে তাও একটা কারণ।

মেয়েটির সঙ্গে সতু বক্সির প্রথম দেখা হয় হাওড়া স্টেশনে, শ্যামলা রঙ ছিপ্ ছিপে রোগা মত—বয়সে যুবতী? না যুবতী বলা চলে না। কিশোরী? তার চাইতে বোধহয় বালিকা বলাই বেশী মানায়। চোখ মুখে এখনও খেলাঘরের ছাপ লেগে আছে। এত বড় একট ঘটনা যে ঘটছে আর ঘটতে চলেছে সে সম্বন্ধে যে কোন অনুভূতি আছে তা কথায় কিংবা ভাবে ভঙ্গিতে বুঝবার উপায় নেই।
আগে থেকেই বন্দোবস্ত ছিল, সতু বক্সি ওকে নিয়ে পৌঁছে দেয় সেই নার্সিং হোমে। রাস্তায় দু-পয়সা দিয়ে কিনে দেয় একটা নোয়া। আর এক দোকান থেকে কিনে দেয় একটা কাঠের সিঁদুর কৌটো আর কিছুটা সিঁদুর। নার্সিং হোমে পৌঁছে দিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তবে সতু বক্সির ছুটি। কিন্তু তাছাড়াও মেয়েটিকে উপদেশ দিতে হয়। হঠাৎ কোন রকম শারীরিক অসুস্থতা হলে কি করবে। কিছু খেতে ইচ্ছে হলে কি করবে। যত কম সম্ভব কথা বলবে নার্সিং হোমের কর্মী আর অন্যান্য রোগীদের সঙ্গে।
কি করে সময় কাটবে? কেন গল্পের বই পড়ে। সতু বক্সি অনেক গল্পের বই এনে দেবে ওকে।
এক গাদা গল্পের বই আর কিছু টাকা পয়সা মেয়েটির হাতে দিয়ে সতু বক্সি বিদায় নেয়।
তারপর সতু বক্সির কাজের ভিতর রইল দুটি। প্রথমতঃ, পরিচিত সর্বত্র খোঁজ নেয়া কোন শিশুকে নিতে চায় এমন কোন পরিবার আছে কি না।
আর দ্বিতীয় কাজ হল সপ্তাহে একদিন করে গিয়ে মেয়েটার খোঁজখবর করা।
'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনার রেডিও আছে? গ্রামোফোন?' একদিন জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি।
'আছে—কেন, বল তো?'
'তার উপরে ঢাকনা আছে? না থাকলে আমি বুনে দিতে পারি। আমি কুরুশ কাঁটা দিয়ে বুনতে পারি, জানেন?'

নিউ মার্কেট থেকে কেনা কায়দাদুরস্ত ঢাকনা যে রেডিও ও গ্রামোফোন দুটিরই আছে, সে খবর একদম অস্বীকার করে যায় সতু বক্সি; বরং মেয়েটিকে কিনে দিয়ে যায় খানিকটা সাদা সুতো আর কুরুশ কাঁটা।
মেয়েটির কাছে দেখা করতে এক সতু বক্সি ছাড়া কেউই আসে না। যে আত্মীয়টি সতু বক্সির ঘাড়ে কাজটি চাপিয়েছেন, তিনি আসেন না। কারণ তার পরিচিত লোকে কলকাতা শহর ভর্তি তাইতে তিনি আর ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে জড়াতে চান না এর ভিতরে। আর কেউ আসে না। কারণ মেয়েটির পরিচিত আর কেউ কলকাতা শহরে নেই।
তাইতে সতু বক্সি গেলে মেয়েটি উল্লসিত হয়ে ওঠে যেন পরমাত্মীয় কেউ এসেছে। সাধারণ মেয়েদের এ সময়ে রেখে দেয়া হয় বাপের বাড়িতে। কারণ শ্বশুর-বাড়ির চাইতেও সেটা বেশী পরিচিত। আর এই মেয়েটিকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে বিদেশে অনাত্মীয় বান্ধবহীন পরিবেশে।
সতু বক্সি এক সপ্তাহের ভিতরেই প্রথম ঢাকনাটা পেয়ে যায়।
নানারকম নক্শা করে কুরশী কাঁটায় বোনা রেডিওর ঢাকনা।
'ভালো হয়েছে ডাক্তারবাবু?' স্কুলের ছোট্ট মেয়ে যেন সেলাইয়ের পরীক্ষা দিচ্ছে।
'চমৎকার হয়েছে।' সত্যিকারের প্রশংসাই করে ফেলে সতু বক্সি। 'গ্রামো-ফোনের ঢাকনাটা কবে পাচ্ছি?'
'আসছে সপ্তাহে নিশ্চয়ই পাবেন', ভারী দেহটা কষ্টে সরিয়ে নিয়ে মেয়েটি বলে। পরের সপ্তাহে সত্যিই সতু বক্সি আর একটা ঢাকনা পেয়ে যায়। আর তার সঙ্গে পায় খানিকটা গাজরের হালুয়া। নার্সিং হোমের আয়ার সঙ্গে মেয়েটির বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। আয়া যোগাড়যন্তর করে দিয়েছে আর মেয়েটি কেবিনে বসে বসে ইলেকট্রিক স্টোভে রান্না করেছে।
'ভালো হয়েছে?' স্কুলের মেয়েটিই এবার রান্নার পরীক্ষা দিচ্ছে।
উত্তরের আশায় মেয়েটি সতু বক্সির দিকে তাকিয়ে থাকে। নির্দোষ নিষ্পাপ শিশুর চোখে প্রশ্ন ভেসে ওঠে।
সতু বক্সির নিজের ছোট বোনের মত? না বোনের চাইতেও ছোট।
সতু বক্সির নিজের মেয়ের মত? না মেয়ের চাইতে একটু বড় হবে।
'হ্যাঁ, বেশ ভালো হয়েছে।' এক চামচ হালুয়া মুখে দেবার পর সতু বক্সির দৃষ্টি মেয়েটির মুখ থেকে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

সমস্ত দেহটা ভারী হয়ে উঠেছে মেয়েটার। সামনে পিছনে সর্বত্রই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। হঠাৎ গলায় আটকে যায় হালুয়াটা। বিষম খেয়ে এক গ্লাস জল গলাধঃকরণ করে পালিয়ে আসে সতু বন্থি।

মেয়েটির বাচ্চা হয় প্রায় চার মাস পর। সুস্থ সবল ছেলে। ছেলেটির ওজন প্রায় সাড়ে সাত পাউণ্ড। সাধারণ বাঙালী শিশুর ওজন জন্মের সময় থাকে পাঁচ থেকে ছ-পাউণ্ড।

বিশেষ কোন কষ্টও পায়নি মেয়েটি বাচ্চা হবার সময়ে।

এখন কয়েক দিনের ভিতরেই সতু বন্থির ছুটি।

নার্সদের উপর কড়া হুকুম সতু বন্থির—মেয়েটির কাছে তার বাচ্চাকে যেন কখনই না দেয়া হয়। আর মেয়েটিকে ওষুধ খাওয়ান হয়, যাতে বুকে দুধ না আসে। সতু বন্থির বন্দোবস্তের কোন ত্রুটি নেই।

খোকা জন্মাবার তৃতীয় দিনে সকালবেলা নার্স খবর দেয় মেয়েটিকে :

'তোমার খোকার পেটের ভিতরে কঠিন অসুখ করেছে। খোকাকে আমরা শিশুর ঘরে রেখেছি। তুমি গিয়ে দূর থেকে দেখে আসতে পারো। কিন্তু ছুঁতে পারবে না।'

তখুনি মেয়েটি ছুটে চলে যায় শিশুদের ঘরে।

তার প্রায় মিনিট পনেরো পরে সতু বন্থি সেদিন নার্সিং হোমে ঢোকে। এ ক-দিন সে রোজই নার্সিং হোমে আসছে।

মেয়েটির ঘরে ঢুকে সতু বন্থি দেখে, বিছানায় খোকা শুয়ে আছে, আর তার মা তাকে আদর করছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাকে চুমু খেয়ে জড়িয়ে ধরে কি যে করবে মেয়েটি ভেবে পায় না।

সতু বন্থি দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ থতমত খেয়ে।

তারপর হুকুম হয় নার্সের উপর : শিশুকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শিশুর যা অসুখ করেছে, তাকে শিশুকে বাঁচাতে হলে তাকে মশারির নীচে খাটের উপরে শুইয়ে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে—তাছাড়া শিশুর জীবনের আশঙ্কা আছে।

নার্স এসে নিয়ে যায় শিশুকে। নার্সের কোন দোষ নেই। সে নিষেধই করেছিল শিশুর মাকে। কিন্তু তার কথা না শুনলে সে কী আর করতে পারে।

অবশ্য এত ওজর না দিলেও চলত, নার্সের উপরে সে রাগ করত না। সতু বদ্যি জানে, বাচ্চা তো আর সত্যিকারের অসুস্থ নয়। তাইতে নার্সের ব্যবহারে সত্যিকারের অসুস্থ রোগী সম্বন্ধে যতটা উদ্বেগ প্রকাশ পায় তা এক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব নয়।

শিশুর মা নিজেও শিশু তাকে যা খুশি বোঝানো যায় কিন্তু নার্স মোটেই শিশু নয়। রোগী ঘেঁটে খাওয়াই তার পেশা।

'হ্যাঁ, শিশুর অসুখটা খুবই বেড়েছে, দেখছ তো। ও চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় ঘুমোচ্ছে, চোখ মেলতেই চাইছে না। এই নার্সিং হোমে তো শিশুর বিশেষ বিশেষ চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নেই—ওকে আজই শিশু-হাসপাতালে নিয়ে যাই—কি বল?'

মেয়েটি পরম বিশ্বাসে শঙ্কিত দৃষ্টিতে সতু বদ্যির কথা শোনে। কোন আপত্তি করে না। সতু বদ্যিই প্রায় তার নিজের বাবার মত।

'আমি সঙ্গে যাব'—মেয়েটির একমাত্র আবদার।

হ্যাঁ, সতু বদ্যির কোন আপত্তি অবিশ্যি ছিল না ওকে নিয়ে যেতে। কিন্তু ওখানে তো অন্য কাউকে ঢুকতে দেয় না। একেবারে কচি সব শিশুরা থাকে। বাইরের লোক যদি কোন রোগের ছোঁয়াচ নিয়ে যায়। সব শিশুর স্বার্থেই তো বোঝা উচিত। এখন তো আর ও কচি খুকিটি নয়, ও এখন মা।

মা! মেয়েটি চমকে ওঠে। কোন আপত্তি করে না মেয়েটি। শিশুকে বিনা বাধায়ই নিয়ে যাওয়া হয় নার্সিং হোম থেকে।

কেবল টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ে মেয়েটির বড় বড় চোখ থেকে।

বাচ্চাদের খেলার পুতুল হারিয়ে গেলে যে রকম পড়ে, সেই রকম?

না। মায়েদের বাচ্চা হারিয়ে গেলে যে রকম পড়ে, ঠিক সেই রকম।

সতু বদ্যি গাড়ি করে বেরিয়ে যায় খোকাকে নিয়ে—মা তাকিয়ে থাকে জানলা দিয়ে। নিস্পলক।

সতু বদ্যির গাড়ি থামে একটা ফিটফাট বেশ গোছানো বাড়ির সামনে।

গাড়িটা থেমেই হর্ন বাজায়।

বাড়ির ভিতর থেকে প্রতিধ্বনি আসে, শাঁখের আওয়াজে আর উলুধ্বনিতে।

সতু বদ্যির শিশুরোগীকে বরণ করে নেয় তার বাবা, মা, পিসী, ঠাকুরমা। নতুন বাড়ি, আত্মীয়েরাও নতুন।

তার নতুন বাবা-মা তাকে গলায় সোনার হার পরিয়ে দেয়। হাতে চুড়ি পরিয়ে দেয়। শিশুটিকে কোলে নেবার জন্যে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কোল থেকে কোলে খোকা ঘুরে বেড়ায়। মা চুমু খায়, ঠাকুরমা চুমু খায়, আর খায় পিসীমা।

তারপর শুইয়ে দেয় নতুন শিশুর খাটের উপরে নতুন বিছানায়। ঢেকে দেয় নতুন মশারি দিয়ে।

সতু বক্সিকে ধন্যবাদ দেয় সবাই—অশেষ ধন্যবাদ।

সতু বক্সি গদি-অাঁটা চেয়ারে আরাম করে বসে। তাকে ঘিরে বসে মা, বাবা, পিসী, ঠাকুরমা।

সতু বক্সি বক্তৃতা শুরু করে। বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত শিশুদের পালন করার নিয়মাবলী।

বক্তৃতা শেষ হবার আগেই সতু বক্সির জন্যে প্লেটে করে খাবার আসে—সন্দেশ, রসগোল্লা আরও অন্যান্য সব খাবার। সতু বক্সি তাকিয়ে থাকে খাবারের প্লেটের দিকে। তাকিয়ে থাকে রসগোল্লার দিকে। ঠিক যেন মায়ের চোখের জলের ফোঁটা একটু বড় হয়ে এসে প্লেটে বসে আছে। একই রকম গোল গোল।

'আজকে আমার বড় তাড়া আছে। আর একদিন এসে খেয়ে যাব।'

সতু বক্সি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। আজকে ও মিষ্টি তার গলা দিয়ে নামবে না!

নার্সিং হোমে খোকার মাকে খোকার মৃত্যু-সংবাদ দেয়া হয় তার পরদিন। সতু বক্সি সত্যিই খুব দুঃখিত। সব রকম চেষ্টাই করা হল কিন্তু বাঁচানো গেল না। সতু বক্সির মুখে অন্ধকার নেমে আসে।

'কী হয়েছিল?' মা প্রশ্ন করে।

'শেষে তো নিউমোনিয়া হল দুটো দিকেই। পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন সবই চেষ্টা করা হল কিন্তু কাজ হল না কিছুই।'

'আমি একটু ওকে দেখব।' দৃঢ়ভাবে উঠে বসে মেয়েটি।

সতু বক্সিরও মেয়েটিকে দেখাতে কোন আপত্তি ছিল না। যাই হোক এই তো শেষ দেখা। কিন্তু এখন তো আর কোন উপায় নেই। খোকার সৎকার হয়ে গিয়েছে। সতু বক্সি নিজেই বন্দোবস্ত করে এসেছে সৎকারের। কি আর করা যাবে ওর তো কেউই ছিল না—তাইতে সতু বক্সিকেই নিতে হল সব দায়িত্ব।

মেয়েটি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। হাপুস নয়নে কাঁদে। উবু হয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বালিশ ভিজিয়ে ফেলে।
মেয়েটিকে কাঁদিয়ে সতু বক্সি খুশি হয়। এতে ভালো হবে মেয়েটির।
তারপর রুমাল দিয়ে ভালো করে মুছে নেয় নিজের চোখমুখ। মুখ তেল তেল করছিল আর চোখদুটোও বোধ হয় একটু ভিজে উঠেছিল।
এ ঘটনা ঘটেছিল প্রায় দু-বছর আগে। মেয়েটি কান্নাকাটি করেছিল খুবই। তবে শেষ পর্যন্ত চলে যায় দেশে তার বাপ-মায়ের কাছে।
এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতির একটা সহজ সমাধান হওয়াতে সতু বক্সিও খুশি হয়ে উঠেছিল নিজের উপরে।
ও, আর সেই বাড়ির কথা। সতু বক্সি সেদিন কিছুই খেতে পারেনি। রসগোল্লাও না, সন্দেশও না। আচ্ছা ভেবে দেখুন—সতু বক্সি যে বলে কিনা আহারই যদি ত্যাগ করব তাহলে দেহত্যাগ করতে ক্ষতি কি—সেই সতু বক্সি কিনা সন্দেশ রসগোল্লা সব ফেলে পালাল।
তবে পরে সতু বক্সি সব উসুল করে নিয়েছিল।
তার দিন সাতেক পরেই সেই বাড়িতেই আবার জলখাবার দিল। সতু বক্সি খেল সে বাড়িতে। সিঙাড়া খেল, সন্দেশ খেল, চা খেল। তবে রসগোল্লাটা কেন যেন সেদিনও খেতে পারল না।
তারপর ছেলেটির অন্নপ্রাশন খেয়েছে। শুধু পোলাও, মাংস, চপ্, কাটলেটই নয়—সন্দেশও, এমন কি রসগোল্লাও।
তবে কি জানেন? কেন যেন রসগোল্লা মুখে দিতেই সতু বক্সির আবার মনে পড়ে যায় ওই হতভাগী মাকে।
এমন কি প্রথম জন্মদিনে যেদিন সতু বক্সির নেমন্তন্ন হল—সেদিনও মনে পড়ে ছিল সতু বক্সির একটা স্কুলে-যাওয়া, পার্কে-বাগানে-খেলা-করা হতভাগীকে।
ওই রাজপুত্তুরের মত কাজলচন্দনে সাজানো খোকাকে দেখে মনে পড়ে যায় সেই হতভাগীকে।
তবে দ্বিতীয় জন্মদিনের নেমন্তন্নে আর মনে পড়েনি সতু বক্সির। ব্যস্ত লোক তো। কত হতভাগাকে নিয়েই তো কারবার করতে হয়, এক হতভাগীকে আর কতদিন মনে রাখবে!
আজ সকালে দু-বছরেরও বেশী বাদে আবার মেয়েটি এসেছে। দেখেই

চিনতে পারে সতু বক্সি। তেমনি ছিপছিপে শ্যামলা মেয়েটিই আছে। বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি এই দু-বছরে।

সতু বক্সি কি চিনতে পারে ? মেয়েটি প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভুলবে কেন সতু বক্সি ? তাছাড়া কুরশীর রেডিওর ঢাকনা আর গ্রামোফোনের ঢাকনা তো তাকে রোজ মনে করিয়ে দেয় মেয়েটির কথা। শুধু কি তাই, গাজরের হালুয়াও ভোলেনি সতু বক্সি। পেটুক লোক তো !

অমায়িক হাসি সতু বক্সির মুখে। এই হাসিটার জন্যেই সতু বক্সি এত জনপ্রিয়।

সতু বক্সির খাসকামরা আর রোগীদের বসবার ঘরের মাঝখানের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে মেয়েটি। তারপর ঘন হয়ে বসে সামনের চেয়ারে।

'আমার ছেলেকে একবারটি দেখতে দেবেন আমাকে, ডাক্তারবাবু ?' করুণভাবে অনুরোধ করে মেয়েটি।

চমকে ওঠে সতু বক্সি। মেয়েটি কি জানে ? একটু জেরা করতে হয়।

জেরা করার দরকার হয় না। ও নিজেই বলে। কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। স্কুল ছুটি হয়েছে তো। ছেলেকে ও অবশ্য কোনদিনই ভুলতে পারেনি তবে কলকাতায় এসে অবধি কয়েক দিন ওর ছেলেকে দেখতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা ডাক্তারবাবুর কোন ভুল হয়নি তো ? যে ছেলেটা মারা গিয়েছিল সে ওরই ছেলে তো।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সতু বক্সি। অবশ্য ভয় পাবার কোন কারণও ছিল না। পুরো ঘটনাটা এক সতু বক্সি ছাড়া আর কেউই জানে না। যাই হোক সতু বক্সি কথা বলা শুরু করে।

ছেলেকে কি করে দেখাবে সতু বক্সি ? মরে গেলে কি আর দেখানো যায়। মায়ের প্রাণ সতু বক্সি বোঝে এখনও ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সতু বক্সি কী করবে, নাচার।

ম্লান অমায়িক হাসি ভেসে ওঠে সতু বক্সির মুখে। সতু বক্সির দোকানদারীর পুঁজি।

মেয়েটি কিন্তু বিশ্বাস করে না। কেন যেন তার মন বলছে তার ছেলে বেঁচে আছে। সে কোন গোলমাল করবে না। শুধু মাত্র একটি বার

দেখে চলে আসবে। সতু বদ্যি এত নিষ্ঠুর কেন? মেয়েটির মিনতি ক্রমশই আরও করুণ হয়ে ওঠে।

সতু বদ্যির দৃঢ়তাও টলে ওঠে একবার সেই মিনতিতে। কিন্তু না। সতু বদ্যি শক্ত করে নেয় নিজেকে। ভবিষ্যৎ জীবনে ওর ছেলের মৃত্যু-সংবাদই ওকে রক্ষা করবে। আর তাছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব দুঃখই সেরে যাবে।

সতু বদ্যি আরও অমায়িক আরও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হ্যাঁ, ছেলের মৃত্যু সংবাদ যে-কোন মায়ের পক্ষেই বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু কী আর করার আছে? মৃত্যু যখন হয়েছে তাকে মেনে না নিয়ে তো উপায় নেই। জীবনকে অস্বীকার করে মৃত্যুর আশ্রয় নেয়া যায় কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করবার কী উপায়?

সত্যু বদ্যির কথায় পরম দার্শনিকতার সুর।

মেয়েটি কিন্তু ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। না, তার ছেলে বেঁচে আছে। নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। তার মন বলছে বেঁচে আছে। সতু বদ্যি চুরি করেছে তার ছেলেকে। সতু বদ্যি চোর। সতু বদ্যি ছেলেধরা। বের করে দিতেই হবে সতু বদ্যির তার ছেলেকে।

সতু বদ্যির কিন্তু আরও ঠাণ্ডা হয়ে আসে কথার সুর। মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান সম্বন্ধে সে বক্তৃতা শুরু করে।

নাঃ, মেয়েটি ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। এবার প্রায় চেঁচানো শুরু করে: 'না খোকা মরেনি, মরেনি, মরেনি। আর যদি মরে থাকে, তাহলে আপনি মেরেছেন আমার খোকাকে, আপনি খুন করেছেন আমার খোকাকে। আপনি ডাক্তার? আপনি তো চোর, আপনি খুনী........!'

মেয়েটি উত্তেজনায় ক্রমশ পাগলের মত হয়ে ওঠে।

সতু বদ্যি চেষ্টা করে ওকে শান্ত করতে। নির্বিকার সমাহিতভাবে সতু বদ্যি বোঝাতে চেষ্টা করে মৃত্যুর অমোঘ নিষ্ঠুরতা।

কিন্তু বৃথা। এবার প্রায় তাড়া করে আসে মেয়েটি:

'আপনি যদি আমার ছেলে ফিরিয়ে না দেন তো আমি চেঁচাব....এখুনি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব—লোক জড়ো করব; পাড়াসুদ্ধ লোককে আমি বলে যাব, সতু বদ্যি চোর, সতু বদ্যি ছেলেধরা, সতু বদ্যি খুনী! দেখি আপনি কি করে

ডাক্তারী করেন এখানে। আমার কি, যার ছেলে গিয়েছে, তার তো সবই গিয়েছে।'

এইবার শঙ্কিত হয়ে ওঠে সতু বদ্যি। আচ্ছা সত্যিই চেঁচাবে না তো মেয়েটি। এই পাড়ায় সবাই সতু বদ্যিকে মানে গুরুঠাকুরের মত। এখানকার রোগে শোকে সতু বদ্যি সান্ত্বনা, ছেলেমেয়ের বিয়েতে সতু বদ্যি মন্ত্রণাদাতা, বাপ-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ের মনোমালিন্যে সতু বদ্যি মধ্যস্থ।

খুব বড় ডাক্তার অবিশ্যি সতু বদ্যি নয়। কিন্তু খুব ভালবাসে, বিশ্বাস করে সবাই সতু বদ্যিকে। যেমন করে পরম আত্মীয়কে—যেমন করে গুরুদেবকে।

মেয়েটি হয়তো চেঁচাতেও পারে। হয়তো একটা বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণা করবে। তাহলে? তাহলে কি কাঁচের ঘরের মত ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে সতু বদ্যির এত দিনের গড়া প্রাসাদ?

না, তা যাবে না। হয়তো সামান্য কলঙ্ক লাগবে তার অকলঙ্ক দেহে।

তাই বা কেন হতে দেবে সতু বদ্যি।

'তুমি একটু বাইরে বসবে খুকী? আমি তোমাকে এখুনি ডাকব। তোমার যা খুশি কোরো তখন। বড্ড খারাপ রোগী আছে একজন। একটু ও ঘরে বসবে? পাঁচ মিনিট?' অমায়িক গম্ভীর অনুরোধ সতু বদ্যির। মেয়েটি শোনে সে কথা। মাঝের দরজা খুলে গিয়ে বসে বাইরের বসবার ঘরে। দরজা আগলে বসে।

সতু বদ্যির বসবার টেবিল, তার পাশে হাত ধোবার বেসিন, তার পাশে একটা ছোট দরজা। খুট্ করে সামান্য আওয়াজ হয় দরজাটা খুলবার সময়। তারপর দুটো সিঁড়ি দিয়ে একেবারে রাস্তায়।

আর রাস্তায় নেমেই ছুট। থপ্ থপ্ করে দু-মন দশ সের ওজন নিয়ে কোলা ব্যাঙের মত। না, অর্ধেক কোলা ব্যাঙ্ আর অর্ধেক হাতীর মত।

কতক্ষণ যে ছুটতে হত কে জানে। সামনে একটা চলতি ট্যাক্শি পেয়ে সতু বদ্যি বেঁচে যায়। একটু নিশ্চিন্ত আরামে পা ছড়িয়ে বসে।

'কোথায় যাব বাবু?'

'সোজা সামনে চালাও।'

গাড়ি চলতে থাকে সোজা—সোজা দক্ষিণে। বালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ ছাড়িয়ে টালিগঞ্জ। সোজা........

সতু বদ্যি বসে বসে ভাবতে থাকে। ভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয়।
শহরের বড় ডাক্তার সতু বদ্যি হতে চায়নি। অনেক মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সতু বদ্যি করতে চায়নি। কলকাতায় বাড়ি গাড়ি সম্পত্তি কিছুই চায়নি সে। সে চেয়েছিল পাড়ার ডাক্তার হতে, পাড়ায় ডাক্তারী করতে। সবাই তাকে ভালবাসবে। বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় প্রাচুর্য না থাক, প্রয়োজনীয়ের অভাবও থাকবে না। বাড়ির সবাই ভালবাসবে। রোগীরা আর মক্কেলরা ভালবাসবে। সতু বদ্যির আশা ছিল অতি সাধারণ। সাধারণ চাষীর মতই সে চেয়েছিল—

A little home well filled
A little land well tilled
A little wife well willed

প্রয়োজনীয়ে পূর্ণ ছোট গৃহ। সুকর্ষিত সামান্য জমি। ভালবাসায় ভরা ছোট্ট সংসার।
সতু বদ্যি পেয়েছেও অনেক। বাহুল্য না থাকলেও প্রয়োজনীয়ের প্রাচুর্য সতু বদ্যির গৃহে আছে। অভুক্ত অতিথিকে বিদায় করতে হয় না সতু বদ্যির। আর জমি মানে সতু বদ্যির মক্কেলরা সত্যিই সুকর্ষিত। তাদের জন্যে সতু বদ্যি ভাবে, চেষ্টা করে, লেখা পড়া করে—।
আর সতু বদ্যিও জানত এতদিন তারা তাকে ভালবাসে আত্মীয়ের মত, শ্রদ্ধা করে গুরুজনের মত।
আর আজ? সামান্য একটা ছিপছিপে শ্যামলা রঙের মেয়ে তাকে তাড়া করে এল? তাকে বলল চোর, বলল খুনী········।
ট্যাক্‌শিওয়ালার ডাকে সতু বদ্যির চমক ভাঙে। টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে গাড়ি চলে এসেছে কুদঘাটা। আর কতদূর যাবে?
সতু বদ্যি জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায়। পিছনে শহর। পাশে আদিম বটগাছ। সামনে আদি গঙ্গা, তারপর গ্রাম। তারপরে বোধ হয় সুন্দরবন।
তাই তো, সতু বদ্যি কোন্‌ দিকে যাবে? সামনে? না পিছনে?

চোপা ভেট্‌কি

রুগীর বাবার নালিশ ঃ

'পোলারে যা জিগাই—চোপাডারে ভেট্‌কি দেয়।'

সতু বদ্যি জিজ্ঞাসা করতেও ভেংচে দেয় ছেলেটা। দাঁত বার করে ভেংচে দেয়। সতু বদ্যি ভ্যাংচানো দেখে ঠিক বুঝতে পারে না রোগটা কি। বরং আরো ঘাবড়ে যায়। ভীষণ ঘাবড়ে যায়।

সতু বদ্যির ঘাবড়ানো? অদ্ভুত ব্যাপার, কোন্ বংশের ছেলে সতু বদ্যি! জানেন? শুনুন তবে।

অনেক দিন আগে। সে ধরুন শ' শ' বছর আগেকার কথা। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের মাথায় পড়ল টাক। নবাবের মাথায় টাক! কত হেকিম কত বদ্যি সব হিমশিম খেয়ে গেল। টাকে আর চুল গজায় না, কত ওষুধ কত মালিশ কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষে নবাব সাহেব বললেন, 'ডাকো মধুসূদন কবিরাজকে।' নৌকো করে সাত দিন বাদে তো এসে পৌছুলেন মধুসূদন কবিরাজ। ভালো করে দেখে শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, তেল একটা বানিয়ে দিতে পারি কিন্তু দাম একটু বেশী পড়বে আর সময় একটু বেশী লাগবে।'

'ক্যা কিমত্?' হুংকার দেন নবাব সাহেব।

'লাখো আসরফি' কবিরাজ মশাই বলেন।

'কুছ পরোয়া নেই। তুমি বানাও ওষুধ।' নবাবী মেজাজ।

'কিছু সময় লাগবে', কবিরাজ মশাই তবুও বলেন 'আর হাজার দশেক আসরফি আগাম।'

নবাব সাহেব তাতেই রাজী। দশ হাজার আসরফি নিয়ে কবিরাজ মশাই গেলেন দেশে।

দিন যায় কিন্তু তেল আর আসে না। নবাব সাহেব দেন তেলের জন্যে তাগিদ আর কবিরাজ মশাই চেয়ে পাঠান হাজার দশেক আসরফি। এই করতে করতে লাখো আসরফি তো শেষ হয়ে গেল কিন্তু তেল আর এল না। বছর ঘুরে যায়। দরবারে গেলে নবাব সাহেবের মনে হয় সবাই তাকিয়ে

আছে টাকের দিকে আর হারেমে গেলেও মনে হয় সবাই তাকিয়ে আছে টাকের দিকে। শেষ পর্যন্ত বেগম সাহেবাও টাক নিয়ে টিকটিক করা শুরু করে দিলেন।

শেষে একদিন নবাব সাহেব হুকুম দিলেন বেঁধে নিয়ে এস মধুসূদন কবিরাজকে। বাঁধতে হল না। কবিরাজ মশাই এমনি এলেন। ট্যাঁক থেকে বার করলেন একরত্তি একটা শিশি।

'এইটুকুন শিশি—এর দাম লাখো আসরফি?'

রেগে নবাব সাহেব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন শিশি। থামে ঠোক্কর খেয়ে তো শিশি চৌচির হয়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে, আর নবাব সাহেবের হুকুম হল, 'বেঁধে রেখে দাও মধুসূদন কবিরাজকে। কাল দরবারের পর ওকে চৌরাস্তার মোড়ে শূলে দেয়া হবে।'

কিন্তু পরদিন সকালেই নবাব সাহেব দেখলেন শিশি ঠোক্কর খাওয়া থামের গায়ে গজিয়ে গেছে ইয়া লম্বা লম্বা চুল।

সুতরাং বেঁচে গেলেন মধুসূদন কবিরাজ।

তবে নবাব সাহেবের চুল গজালো কিনা তা অবিশ্যি জানা নেই।

সেই মধুসূদন কবিরাজ হল সতু বদ্যির পূর্বপুরুষ। তারই রক্ত সতু বদ্যির দেহে। সেই সতু বদ্যির ঘাবড়ানো?

আর তাছাড়া ভ্যাংচানি? এই তো সেদিন সতুবদ্যি গিয়েছিল মিসেস সেনকে দেখতে। মিসেস সেন বেশ ভালো গান গাইতে পারেন। বেশ ভালো মানে গান গাওয়াই তাঁর নেশা। পেশা নয় কারণ মিঃ সেনের যা অর্থ আছে তারপর আর কোন পেশার প্রয়োজন হয় না। তবে রেডিওতে উনি গান গেয়ে থাকেন, দু-একখানা গান রেকর্ডও হয়েছে।

মিঃ সেনের টেলিফোন পেয়ে সতু বদ্যি গিয়েছিল মিসেস সেনকে দেখতে। বাইরে থেকে বেল বাজাতেই মিসেস সেন দরজা খুলে দেন, দরজাটা খুলতেই সামনে ঘেরা বারান্দায় বসে আছেন মিঃ সেন। গদি-আঁটা সোফা সেট আর কাশ্মিরী ছোট টেবিল, পার্শী কার্পেট আর মোরাদাবাদী ফুলদানী সব দিয়ে সাজানো বাড়িতে অর্থের চাইতেও রুচির পরিচয় বেশী চোখে পড়ে।

খুক করে ছোট একটু কাশি রুমাল দিয়ে চাপা দিয়ে ভদ্রমহিলা সতু বদ্যিকে গদিমোড়া চেয়ার দেখিয়ে দেন—'বসুন'।

'বলুন' বলে সতু বদ্যি আরাম করে বসে।

উত্তর দেন মিঃ সেন, মিসেস সেনের সামান্য একটু কাশি হয়েছে। গলাটা খুস খুস করে আর মাঝে মাঝে কাশি হয়। কাশির সঙ্গে গয়ার খুব বেশী বার হয় না। কিংবা খুব বেশী যে কষ্ট হয় তাও নয়। কিন্তু ওঁকে আবার গান গাইতে হয় কিনা তাইতে অসুবিধা। জোরে কথা বলতে গেলেই কি রকম কাশি ওঠে—গান গাওয়া তো দূর স্থান।

মিসেস সেনের গলা দেখা ভারি মুশ্‌কিল, সতু বদ্যি তা জানে। কেন যেন মিসেস সেনের ধারণা হাঁ করে জিব বার করে 'অ্যা এ্যা' করে চেঁচানো—তাও বিশেষ করে একজন বাইরের ভদ্রলোকের সামনে—খুবই রুচিবিগর্হিত ব্যাপার। তাইতে গলা দেখতে চাইলে প্রতিবারই সতু বদ্যিকে আপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য গলাটা মিসেস সেন দেখান। সতু বদ্যিও প্রেসক্রিপ্‌শানটা লিখতে শুরু করে। ব্যাগের উপরে প্যাডটা রেখে ঘাড় নীচু করে প্রেসক্রিপ্‌শানটা লিখতে হয়। আর এই ফাঁকে মিসেস সেনও একটু গুছিয়ে বসেন।

এই সময় একটা দৃশ্য সতু বদ্যি আড় চোখে দেখে। প্রায়ই দেখে তবুও দেখা শেষ হয় না। সেটা হল মিসেস সেনের ভ্যাংচানি। এই সময় মিঃ সেন খানিকটা ইঙ্গিতে আর খানিকটা ভাষায় বলবেন—'সেই তো গলা দেখাবে তবুও রোজ ওই এক ঢং।' আর মিসেস সেন অস্ফুট 'আহাহা' বলে ভেংচে দেবেন একবার দাঁত মুখ মিঃ সেনের দিকে। ফর্সা রঙের পাড়ে গোলাপী ঠোঁটের আভার মাঝখানে ধবধবে সাদা দাঁতের ভ্যাংচানি—অপূর্ব। এই রকম দাঁত দেখেই হয়তো শ্রীজয়দেব লিখেছিলেন—

বদসি যদি কিঞ্চদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্।

সত্যিই এই রকম দাঁতের আলোয় শুধু যে মনের অন্ধকারই দূর হয় তাই নয় সারা বাড়িই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু কই, সে ভ্যাংচানিতেও তো সতু বদ্যি ঘাবড়ায়নি, প্রেসক্রিপ্‌শানটা সতু বদ্যি ঠিকই লিখেছিল।

আচ্ছা—এ না হয় মেয়েদের ভ্যাংচানি। কিন্তু সেই রায় চৌধুরীদের বাড়ি? সকালবেলা ডেকেছেন মিসেস চৌধুরী। রায় চৌধুরী মশাইয়ের শরীর খারাপ।

বিরাট বাড়ি, সামনে দেউড়ীতে দরোয়ান বসে খইনি খায়, শ্বেত পাথরের

সিঁড়িতে কার্পেট পাতা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ফুলদানীর বাসী ফুলের সেরভী নাকে এসে লাগে। মিসেস চৌধুরী ডেকে নিয়ে যান ঘরের ভিতরে। ঘরের বড় খাট আর বড় আয়না, প্লাইয়োফোমের গদি আর সিল্কের পর্দায় রুচির চাইতেও অর্থের পরিচয় পাওয়া যায় অনেক বেশী।

'বলুন' আরাম করে বসে সতু বদ্যি প্রশ্ন করে।

বলেন কিন্তু মিসেস রায় চৌধুরী। কাল রাত্তিরে নিমন্ত্রন ছিল কয়েকটি বন্ধুর। খাদ্যের চাইতে মদ্যই বেশী চলেছে সবার। তারপর সকাল বেলা উঠে শরীরটা········

সতু বদ্যি জানে, অনেকবারই আসতে হয়েছে কিনা। ইংরেজি ভাষায় একে বলে পরের সকাল (night after), বাংলায় বলে খোয়ারি। মাতালদের বেশী মদ খাবার পর পরদিন সকালবেলা এই রকম হয়। রায় চৌধুরী মশাইয়েরও হয়েছে বহুবার।

সোডাবাইকার্ব গরম জলে গুলে নিয়ে মিঃ রায় চৌধুরীকে একগ্লাস খাইয়ে দেয় সতু বদ্যি। খানিকক্ষণ বাদে ভদ্রলোক তুলে দেন প্রায় সবটাই বমি করে। মাতালের বাসী বমির গন্ধে ঘরের হাওয়া বিষিয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে সতু বদ্যি যেন স্বগতোক্তি করে, 'প্রায়ই তো এই রকম হয় তবুও কেন যে করেন।'

'তোমার তাতে কি ডাক্তার ?' বৃদ্ধ রায় চৌধুরী খিঁচিয়ে ওঠেন তাঁর লালচে কালচে সাদাটে মেশানো দাঁতের পাটি।

বাকি কথাগুলো চৌধুরী মশাই আর বলেন না। অকথিত থাকলেও বক্তারও বলা হয় আর শ্রোতারও শোনা হয়। সেটা হল—তোমার কাজ করে টাকা রোজগার করা নিয়ে কথা—ফি দিচ্ছি যা বলি করে যাও।

আর সত্যিই এখানে সতু বদ্যিকে চার টাকার বদলে ষোল টাকা ফি দেয়···· সেও প্রতি মাসেই বেশ কয়েক বার সুতরাং সতু বদ্যি আর রাগ করতে পারে না।

আর তাছাড়া ও ভ্যাংচানি তো রাগের ভ্যাংচানি নাও হতে পারে।

সারারাত খালি পেটে মদ খাবার ফলে গাটা তো এখনও গুলিয়ে উঠছে। তার জন্যেও মুখ ভ্যাংচাতে পারে।

যাই হোক এমন ভ্যাংচানিতেও কিন্তু সতু বদ্যি ঘাবড়ায়নি।

কিন্তু তবুও এই ভ্যাংচানি—এই বাচ্চা ছেলেটার ভ্যাংচানি দেখে সতু বদ্যি

সত্যিই ঘাবড়ে যায়। অতবড় কবিরাজ বংশের ছেলে সতু বদ্যি—এত রকম ভ্যাংচানি দেখা সতু বদ্যি এই বাচ্চা ছেলেটার ভ্যাংচানি দেখে ঘাবড়ে যায়।

ডাকতে এসেছে সকালে। বর্ষাকাল। অনবরত বৃষ্টি হয়ে রাস্তাঘাট জলে কাদায় বিশ্রী হয়ে আছে। খাটনিও পড়েছে সতু বদ্যির প্রচণ্ড। বস্তির পাশ থেকে যে রাস্তা সেখানে আর কোন গাড়ি ঘোড়া চলে না। সেই সরু রাস্তার পাশ দিয়ে চলে গেছে আরো সরু নালা। নালা দিয়ে জল আসে বস্তি থেকে, রাস্তা থেকে, রেল লাইনের ওপারের বস্তি থেকে। শহরতলী ধোয়া জল রাস্তার পাশ দিয়ে এসে নালা আবার এঁকে বেঁকে লাইন পার হয়ে চলে গিয়েছে শহরের বাইরে। বর্ষাকালে জলের স্রোত বেশ জোরেই চলে। নালার তলায় শ্যাওলাগুলো দেখা যায়। এই নালায় বস্তির মেয়েরা কাপড় কাচে, বাসন মাজে। আঁজলা ভরে নিয়ে ওই জলে মুখ ধোয়। খাওয়াটা ছাড়া সবই করে। শিউরে ওঠে সতু বদ্যি। ওতে না আছে এমন বীজাণু নেই। ওই বাসন থেকে তো সব জীবাণু যাবে খাবারে। 'কি করব বস্তিতে জল নাই।' সঙ্গের লোকটি যুক্তি দেখায়।

সঙ্গের লোকটি বক বক করেই চলে, 'সকালে খোকারে ডাকলাম—খোকায় উত্তরই দিল না; চোপা ভেট্‌কি দিল।'

চোপা ভেট্‌কি (মুখ ভ্যাংচানি) সতু বদ্যি বোঝে না? চোপাডারে ভেট্‌কি দিল। এই নর্দমা দেখে সতু বদ্যি শিউরে উঠছে? সামনে ওই যে মোষের খাটাল? আর পিছনে যে কাদার সাগর? তার মাঝে যে কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে? সেইটায় ও আর খোকা থাকে। কি আছে ওই কাদায়? মাটি আছে, জল আছে, গোময় আছে, মহিষময় আছে, নরময় আছে........। যাবার উপায়? ওদের ঘরে? মাঝখান দিয়ে ইট পাতা আছে। তবে ইটের উপর দিয়ে হলেও সাবধানে যাওয়া উচিত। পা পিছলে কাদার ভিতরে পড়ে গেলে মুশ্‌কিল, একহাঁটুরও উপর কাদা কিনা—ওঠা ভারি মুশ্‌কিল। এই যে বিশ্রী পচা গন্ধ—সে গন্ধ তাহলে লেগে থাকবে সারা গায়ে। এই তো সেদিন ওর খোকা পড়ে গিয়েছিল, খোকার আবার কোমর অবধিই ডুবে গেল। শেষে অনেক কষ্টে বাঁশ দিয়ে গোয়ালারা ওকে টেনে তোলে। হাত পা ছড়ে গেল। মহা মুশ্‌কিল।

কথা বলতে বলতে সতু বদ্যি এসে যায় খাটালের পিছনে, মাঝখানে কাদার

সমুদ্র। ইটের উপর দিয়ে পার হবার সময় মনে হয় যেন বৈতরণী পার হচ্ছে। পিছলে পড়ে গেলেই অতল কাদা। বৈতরণীর সঙ্গে তফাৎ কেবল অবলম্বনে। সেখানে থাকে চোদ্দ আনা দামের গোরুর লেজ আর এখানে সতু বদ্যির ডাক্তারী ব্যাগ।
তা খোকা সেদিন পড়ল কি করে? ওরা সব টুকরো কাঠ বেচে কিনা, কাঠ গোলা থেকে কুড়িয়ে বেচে। সেই টুকরো কাঠ জ্বালিয়ে বাবুরা উন্নুন ধরান। তার এক ঝুড়ি কাঠ মাথায় নিয়ে ছেলেটি ঘরে ফিরছিল। ৯।১০ বছরের ছেলে তো। পা পিছলে পড়ে গেছে।
ঘরে ঢুকে শেষ পর্যন্ত সতু বদ্যি রোগীর কাছে পৌঁছায়। গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে রে?'
ছেলেটা কেঁপে ওঠে। হাত পা সারা শরীর শক্ত হয়ে যায়, আস্তে আস্তে শরীরটা বেঁকে যায় ধনুকের মত। তারপর ভেংচে দেয় দাঁত বার করে। সেই চোপা ভেটকি।
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সতু বদ্যি। ভ্যাংচানিটা কি রকম? ঠিক মাথায় আসে না। মাথা চুলকোয় সতু বদ্যি। আরো চুলকোয়। স্মরণ করে ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ ডাক্তারকে। স্মরণ করে তার উপরে চোদ্দ পুরুষ কবিরাজকে—নাঃ, বোঝা আর যায় না। ভ্যাবাচাকা মেরে দাঁড়িয়ে থাকে মধুসূদন কবিরাজের বংশধর সতু বদ্যি।
ছেলের বাবার গল্প কিন্তু তখনও শেষ হয়নি।
সে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় 'ওই ওইখানে পরছিল খোকা।'
হঠাৎ সতু বদ্যির চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে যায়। কাদায় পড়েছিল কয়েক দিন আগে। সারা গায়ে ছড়ে গিয়েছিল। কাদায় নানা রকম মল আছে।
চোখ খুলে তাকায়....আর শরীরের খিঁচুনি? ও তো Opisthotonos (অপিস্থ-টোনোস—ধনুকের মত বেঁকে যাওয়া)। মুখের খিঁচুনি? চোপা ভেট্‌কি? ও তো রাইসাস্ সার্ডনিকাস্ (Rhisus Sardonicus) ধনুস্টংকার অসুখের রোগীর বেঁকে যাওয়া মুখ। আর রোগ? রোগ তো Titanus (ধনুস্টংকার)। জাত বদ্যির ভুল হয় না, বৈতরণীটা কলকাতার এত কাছে তা জানা ছিল না বলেই সতু বদ্যির যা গোলমাল হচ্ছিল।
অ্যাম্বুলেন্স ডেকে সতু বদ্যি রোগীকে পাঠিয়ে দেয় হাসপাতালে।

লোকটা দু-দিন বাদে আবার এসেছে একটা চিঠি নিয়ে। হাসপাতাল থেকে চিঠি দিয়েছে। সতু বদ্যি যদি পড়ে দেয়। বস্তিতে তো ইংরেজি পড়নেওয়ালা লোক নেই।

চিঠিটা খুলে সতু বদ্যি পড়ে। হাসপাতালে খোকা মারা গিয়েছে। ওর সৎকারের বন্দোবস্ত না করলে হাসপাতাল থেকেই বন্দোবস্ত করা হবে।

ধনুস্টংকারেই মারা গিয়েছে। জাত বদ্যির রোগ নির্ণয়ে ভুল হয়নি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে থাকে সতু বদ্যি। লোকটা জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে। সতু বদ্যি একদম চুপ, চোখটা কি রকম ঝাপসা হয়ে আসে। সামনে ভাসে হাসপাতালের চিঠি........মিসেস সেনের ভ্যাংচানি........রায় চৌধুরীর ভ্যাংচানি........চোপা ভেট্‌কি........।

আর কাদার সমুদ্দুর বৈতরণী।

ছোডমনুর আত্মহত্যা

সতু বদ্যির বসবার ঘর আর রোগীদের অপেক্ষা করবার ঘর আসলে একটাই। পার্টিশন দিয়ে দুটো করা হয়েছে। মাঝখানে পার্টিশানের উপরে বড় পাখা ঘোরে বন্‌বন্ করে। একই পাখা সতু বদ্যিরও মাথা ঠাণ্ডা রাখে আবার অপেক্ষমান রোগীদেরও ঠাণ্ডা রাখে।

পার্টিশনের উপরে একটা মাটির বুড়ো। পাখার হাওয়ায় বসে বুড়ো খালি মাথা নাড়ে আর নাড়ে। সতু বদ্যির সহকারী—নাম সাঙ্কোপাঞ্জা। সতু বদ্যির এক খোকা রোগী মিনতি করে তার কাছে, 'দাও না আমাকে পুতুলটা।' 'আহাহা—চার টাকা দামের পুতুলটা অমনি দিয়ে দেব—আবদার।' সাঙ্কোপাঞ্জা খিঁচিয়ে ওঠে।

'দু-আনার পুতুলটা কি করে চার টাকা হল, কম্পাউণ্ডার বাবু?' হাসিমুখে প্রতিবাদ করেন খোকার মা।

'কি করে হল জানেন?'

গল্প শুরু করে সাঙ্কোপাঞ্জা। সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। সেই যে কাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তার আর শেষ নেই। কখনও অল্প কখনও বেশী। গরম কালে এই রকম বৃষ্টি! গরম কাল মানে শ্রাবণের শেষ। গরম কাল—বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা হয়ে শহুরে লোক খুশি। মাটি ভিজে ওঠে—গ্রামের চাষীরা খুশি। কলকাতার রাস্তায় বান ডাকে, রিক্‌শাওয়ালারা খুশি। লোকজনের আমাশা হয়, জ্বর হয়, নানা অসুখ-বিসুখ হয় সতু বদ্যিও খুশি। তবে জলে ভিজতে হয়, কাদায় হাঁটতে হয়—পরিশ্রম বেশী হয়। কিন্তু টাকা রোজগার করতে গেলে পরিশ্রম তো করতেই হবে।

সকাল থেকে জলে ভিজে বাদলার দিনে দুপুর বেলা ভুনি খিচুড়ি আর ইলিশমাছ ভাজা খেয়ে একটি পান মুখে দিয়ে সতু বদ্যি সবে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়েছে। বীরেন ঘোষ তাঁর স্বাস্থ্য বইয়ে লিখেছেন গ্রীষ্মকালে দিবা নিদ্রা শুধু আরামদায়কই নয় স্বাস্থ্যকরও বটে। সতু বদ্যির চোখ সবে দিবা নিদ্রার আমেজে বুজে এসেছে এমন সময় ডাক—

'ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু!'

'কে?' চোখ না খুলেই সতু বদ্যি সাড়া দেয়।

'তরাতরি আসেন ডাক্তারবাবু—ছোডমনু আত্মহত্যা করছে।'

একে দুপুরবেলা ঘুম ভাঙা তারপর আত্মহত্যা করেছে—সতু বদ্যি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। 'আত্মহত্যা করেছে তো পুলিসে খবর দাও—আমি তার কি করব?'

'অখনো মরে নাই—ক্যারাসিন খাইয়া কেবল আত্মহত্যা করছে।'

সতু বদ্যি উঠে বসে। মরেনি এখনো সুতরাং চেষ্টা কিছু করা উচিত। আর তাছাড়া কেরোসিনের বিষক্রিয়া কম কাজেই হয়তো বাঁচানো যেতেও পারে।

বৃষ্টি পড়ে শহরের যা অবস্থা হয়েছে পথ চলাই দুর্ঘট। খানিকটা শুকনো হেঁটে কিংবা স্থলচর গাড়িতে যাওয়া যেতে পারে। খানিকটা জলে ডুবে আছে—সাঁতরে কিংবা নৌকায় যাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সতু বদ্যির রোগী যেখানে থাকে সেখানে না শুকনো পাকা রাস্তা—না জল, খালি কাদা। জুতো বগলে করে হাঁটো আর তাছাড়া....। তাছাড়া আর কিছু নেই। এক যদি অ্যাম্ফিবিয়ান ট্যাঙ্ক বা উভচর সামরিক গাড়ি জোগাড় করা যায়।

আর তাছাড়া থাকবার ঘরগুলোর যা ছিরি। উপরের টালির ছাদের জোড় খুলে গিয়েছে। নীচের মেঝের মাটি জল পড়ে কাদা। তাও যদি নরম কাদা হত। শক্ত মাটিতে পিছল কাদা হয়ে, যা অবস্থা হয়েছে অসাবধান হলেই দু-মন দশ সের ওজন নিয়ে পতন।

রাস্তায় যেতে যেতে সতু বদ্যি রোগীর কাহিনী শুনে নিয়েছে। রোগীর বাবা পটুয়া, বাঙাল দেশের লোক, দেশ ভাঙাভাঙিতে কলকাতায় এসে পড়েছে। দেশে থাকতেও অবস্থা ভালো ছিল না। কখনও প্রতিমা গড়ে কখনও পট এঁকে কিছু রোজগার হত। তাছাড়া বাড়িতে গোরু ছিল। সামান্য কিছু ভাগ চাষও ছিল। কিন্তু এখানে এসে এক ঠাকুর গড়ে বিক্রি করা ছাড়া আয়ের আর কোন পথ নেই। অবিশ্যি ঠাকুর গড়ে বিক্রির আয় এখানে দেশের চাইতে অনেক বেশী কিন্তু সবই কিনতে হয় কিনা তাইতে অসুবিধা। শুধু যে নুন তেল কিনতে হয় তাই নয়, চাল ডালও কিনতে হয়, শাকসব্‌জি তরীতরকারি সবই কিনতে হয়। দুধ-দই অবিশ্যি কখনই কেনেনি। দেশেও নয় এখানেও নয়। দেশে মাঝে মাঝে বিনা পয়সায় মিলত—এখানে পয়সাও নেই, মেলেও না।

দেশের নিয়ম ছিল সারা শ্রাবণ মাস রোজ মনসামঙ্গল পড়া। পড়তে পড়তে যেদিন শেষ হবে, সে দিন হবে মনসা পূজো আর তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া। এই পাঁচালী পড়া শেষ আর শ্রাবণ মাস শেষ প্রায় এক সঙ্গেই হয়, স্থতরাং শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন হয় ধুম করে মনসা পূজো। মনসার মূর্তি হয়, ফণা ধরা সাপ সব সারের পর সার দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে পূজো। খাওয়া হয় ইলিশ মাছ আর পিঠে। পিঠেতে থাকে আখের গুড়, চাল, কলা আর তাল। তালের রস, পাকা কলা আর গুড় চটকে সরষের তেলে ভেজে হয় তালবড়া, তালের রস দুধ দিয়ে জ্বাল দিয়ে হয় তাল-ক্ষীর। চালবাটা, তালরস আর কলা চটকে কলা পাতায় রেখে তার উপর আবার কলাপাতা দিয়ে মুড়ে লোহার শুকনো তাওয়ায় সেঁকে হয় পাতা পিঠে। সারাদিন বৃষ্টি পড়ে আকাশ মেঘলা হয়ে থাকে, মনসা দেবীর পূজো হয়। বুড়ীরা গল্প করে বাচ্চাদের মনসা মঙ্গলের আর ছড়া বলে—

যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপানি
সেই হাতে পূজিব কি ব্যাঙ-খেকো কানি॥

আর—

কানি কি করবি কর।
তবু না কাতর হবে চাঁন্দসদাগর॥

আর ছেলেরা গল্প শোনে, পূজো দেখে আর পিঠে খায়।

সতু বদ্যির রোগীর বাবার যে ছেলেটা কেরোসিন তেল খেয়েছে—সেটা আবার হাবা। বেশী বুদ্ধি নেই, জন্ম থেকেই একটু বোকা। সে ক-দিন আগে থেকেই লাফাচ্ছিল—মনসা পূজায় পিডা খামু। কিন্তু পটুয়া রথের মেলায় পুতুল বেচেছিল আষাঢ় মাসে, তারপর আর পয়সার মুখ দেখেনি বললেই হয়। চাল অবিশ্যি তখনিই কিছু কিনে রেখেছিল কিন্তু শুধু চালেই তো আর হয় না—কলা লাগে, গুড় লাগে, সরষের তেল লাগে, তাল লাগে, কলকাতা শহরে আবার সবই কিনতে হয়। তাইতে পটুয়া বলেছিল—মনসা পূজায় যদি দু-একটা নাগের মূর্তি বিক্রি হয় তাহলে বরং দু-একদিন বাদে পিঠে হবে। কিন্তু ছোডমনু বিশ্বাস করেনি। আজকে মনসা পূজার দিন, ছেলে খেতে বসেছে। ভাতই খেতে বসেছে। সঙ্গে শাকসেদ্ধ আর শাকের ঝোলও আছে। এমন কিছু শুকনো ভাত দেওয়া হয়নি।

ছোডমন্নু হঠাৎ বলল, 'পিডা কই !'

খোকার মা বোঝাল, অনেক বুঝিয়ে বলল—তাও ছোডমন্নু শোনে না। খোকার মাও সারাদিন মনসা পূজার উপোস, খাটুনি আর অভাব-অভিযোগে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। শেষে দিয়েছে এক চড় কষিয়ে, 'খা পিডা-খা'। আর ছোডমন্নুও তেমনি ছেলে। সামনে ছিল এক বোতল কেরোসিন, বোতলটা তুলেই ঢকঢক করে খানিকটা খেয়ে ফেলছে।

'অখন পোলার প্রাণডা যায়।'

ঘরে ঢুকে সতু বদ্যি নাড়ী পরীক্ষা করে রোগীর। ভালোই আছে, সবই পরীক্ষা করে—ভালোই আছে।

'কেরোসিন খেয়েছিস কেন ?' সতু বদ্যি জিজ্ঞেস করে।

'আত্মহত্যা করছি....' গর্জন করে ছেলেটি।

ছোডমন্নুর পিছনে আচমকা একটা লাথি পড়ে—প্রচণ্ড লাথি। ছোডমন্নু গড়িয়ে পড়ে। আবার একটা লাথি পড়ে উল্টো দিক থেকে। ছোডমন্নু এবার গড়ায় উল্টো দিকে। আর্তনাদ করে—'ছাড়িয়া দেন ডাক্তারবাবু—মরিয়া যামু........'

'না তোকে লাথি মেরেই মেরে ফেলব। পয়সা দিয়ে কেনা কেরোসিন তেলে তুই আত্মহত্যা করবি? হারামজাদা—।' এবার সতু বদ্যির গর্জন করবার পালা।

'আর আত্মহত্যা করুম না....আর পিডা খামু না....' আর্তনাদ করে ছোডমন্নু।

'তাহলে খা—এখনি এই জল খা', সতু বদ্যি এগিয়ে দেয় এক বালতি নুনগোলা জল।

ছোডমন্নু জল খায় আর বমি করে। বমি করে আর জল খায়। আর বলে 'আর আত্মহত্যা করুম না। আর পিডা খামু না।'

রোগী দেখে সতু বদ্যি বলে, 'আমার ফি ?'

'টাকা তো নাই ডাক্তারবাবু!' পটুয়া মিনতি করে। হঠাৎ ছোডমন্নুর মা কোত্থেকে হাজির করে একঝুড়ি মাটির খেলনা। আম, জাম, কাঁঠাল, হাতী, ঘোড়া, বাঘ, লক্ষ্মী, সরস্বতী—ঝুড়িভর্তি, 'সব নিয়া যান ডাক্তারবাবু, আপনে আমার ছোডমন্নুরে বাঁচাইছেন।'

'মাইরি আর কি ? পয়সা তো দিলেই না এখন পকেট থেকে কুলিভাড়া খরচ না করালে চলবে কেন ? এ না হলে আর বাঙাল।' সতু বদ্যি খিঁচিয়ে ওঠে। তারপর কি ভেবে তুলে নিয়ে এসেছে এই বুড়োটা।

পাখার হাওয়া লাগে আর ঘাড় নাড়ে বুড়োটা। সতু বদ্যি যা বলে তাইতেই বুড়ো ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।
'বুঝলে খোকা—সেই জন্যেই ওই বুড়োটার দাম চার টাকা।' সাঙ্কোপাঞ্জা গল্প শেষ করে।
'সাঙ্কোপাঞ্জা—' সতু বদ্যি ডাক দেয় 'খোকাকে বুড়োটা দিয়ে দাও।'
তবুও দাঁড়িয়ে থাকে সাঙ্কোপাঞ্জা, খুব ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না।
'তুমি কিছুই বোঝো না সাঙ্কোপাঞ্জা, ওর তুলোর দাড়িগুলো উঠে গেছে কিনা। এখন আর ও সায় দেয় না। খালি মাথা নাড়ে আর আপত্তি করে। আমার মনে হয় ও বলছে—আর আত্মহত্যা করুম না আর পিডা খামু না....'
ভারি বিশ্রী লাগে।
সতু বদ্যি কথা শেষ করে।
ভারি ক্লান্ত সতু বদ্যি।

পাপচক্র

ইতিহাস শুনে কেলে ডাক্তার পুরো ইতিহাসটাই শুনতে চায়। বড় বিপদজনক কাজ কিনা, সব না শুনে হাত দেয়া মুশ্‌কিল, আইনবিরোধী কাজ তো!
আস্তে আস্তে সতু বক্সি ইতিহাস শুরু করে—

কালো রোগা লম্বামত মেয়েটি, গোলাপী রঙের শাড়ী, কালো গায়ের রঙ, সাদা শাঁখা, লাল সিঁদুরের টিপ আর কালো কাজলের রেখায় দিব্যি মিষ্টি দেখতে ; কিন্তু হলে কি হবে, রোগের ইতিহাস আর ডাক্তারের কাছে আসবার কারণ বার করতে সতু বক্সির ঘাম ছুটে যায়।
'বলুন'—রোগী দেখার ঘরে মেয়েটিকে বসিয়ে সতু বক্সি প্রশ্ন করে।
মেয়েটি নিরুত্তর।
'কি হয়েছে'—ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে খেলে যায় লাজুক হাসি।
ডাক্তার তো। আসলে মিস্তিরি ক্লাসের লোক, দেহযন্ত্রের ঠিক কি জিনিস বিকল হয়েছে তাই খুঁজে বার করা আর মেরামত করা এই তার পেশা। মেয়েটির মুখের লাজুক হাসির সমঝদার সতু বক্সি নয়।
সে এখন কিশোরীই হোক আর যুবতীই হোক, সতু বক্সির খাতায় মেয়েদের বয়স তিনটে,—ফ্রক, শাড়ী আর বুড়ী।
'কি হয়েছে বলবেন তো—' এবার সতু বক্সির কথায় বিরক্তি ফুটে ওঠে।
মেয়েটির স্বামী এবার এগিয়ে আসে তার স্ত্রীর সাহায্যে।
বিয়ে হয়েছে প্রায় আড়াই বছর হল, ছেলেটি কারখানার ফিটার মেকানিক। মেয়েটির বয়স তখন প্রায় পনেরো বছর। স্বাস্থ্য তখন আরো ভালো ছিল। দিব্যি গোলগাল চেহারা, কিন্তু তারপর গত দু-বছরে ক্রমশ রোগা হয়ে চলেছে। তাছাড়া আগে বেশ খেত, এখন মোটেই খেতে পারে না। আর আগের মত হাসিখুশি ভাবও নেই। সব সময়ই মনে হয় একটু বিষণ্ণ।
প্রথমে প্রশ্ন, তারপর পরীক্ষা। দুটো মিলিয়ে সমস্যাটা কি বোঝা যায়।
গত দু-বছরে মেয়েটির সন্তানসম্ভাবনা হয়েছে দু-বার। কিন্তু দু-বারই নষ্ট হয়ে

গিয়েছে। মেয়েটি সন্তান চায়, খুব বেশী রকমই চায়। মধুসূদন কবিরাজের বংশধর সতু বন্ধি তা বেশ বুঝতে পারে। শুধু যে বস্তির বুড়ীরা আড়ালে ফিস ফিস করে বাঁজা বলে তাইতে সন্তান চায় তা নয়—সন্তান চায় নিজের জন্যে—নিজের বুকের ভিতরে মানুষ হবে তার জন্যে।
তাছাড়া দু-বার গর্ভ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে শরীরটাও একটু রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সমস্যার সমাধান করতে হলে খুঁজে বার করতে হবে সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ কি। প্রথমতঃ, হতে পারে অপরিণত জরায়ুর পূর্ণকাল পর্যন্ত সন্তান ধারণের অক্ষমতা। দ্বিতীয়তঃ, ঘটনাচক্রে পর পর দু-বার অকারণে গর্ভ নষ্ট—সতু বন্ধির শাস্ত্রে বলে—কেন হয় তার কারণ জানা নেই। তৃতীয়তঃ, যদি সিফিলিস রোগগ্রস্ত মা হন।
চতুর্থতঃ........
তবে সতু বন্ধি খুশি হয় যদি তৃতীয় কারণই আসল কারণ হয়। চিকিৎসা করে তাহলে সহজেই মেয়েটির ইচ্ছে পূরণ করা যায়। আর তাছাড়া মেয়েটির রক্তশূন্যতারও চিকিৎসা করতে হবে।
ভ্যাসারম্যান পরীক্ষা কান পরীক্ষার জন্যে রক্ত নিয়ে আর রক্তশূন্যতার ওষুধ দিয়ে সাত দিন বাদে আসতে বলে সতু বন্ধি ছেড়ে দেয় রোগীকে।
সাত দিন বাদে রোগিনী আর তার স্বামী আবার এসেছে সতু বন্ধির কাছে। গম্ভীর হয়ে বসে আছে সতু বন্ধি তার বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পিছনে। তার হাতে একটা টাইপ-করা কাগজ।
'আমার কাছে যে এসেছেন চিকিৎসার জন্যে আমার ফি দেবেন তো।' অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে সতু বন্ধি—মেয়েটিকেই প্রশ্ন করে।
'আমরা গরীব মানুষ ডাক্তারবাবু তবে আপনার ফি নিশ্চয়ই দেব।' মেয়েটির স্বামী উত্তর দেয় এগিয়ে এসে।
'আপনার কাছে উত্তর চাইনি'—সতু বন্ধি আরও গম্ভীর হয়ে যায়।
'দেব'—লাজুক মেয়েটি কথা বলে।
'আমার ফি জানেন ?'
'চার টাকা'—ভয়ে ভয়ে আবার উত্তর দিতে এগিয়ে আসে মেয়েটির স্বামী।
'আপনাকে জিজ্ঞেসও করিনি আর উত্তরও আপনি জানেন না তবুও বার বার কথা বলা চাই'—সতু বন্ধি বিরক্ত হয়ে ওঠে।
'চার টাকা তো ফি বটেই কিন্তু তা ছাড়াও—আমার চিকিৎসার পরে যদি

আপনাদের বাচ্চা হয় তাহলে বাচ্চার যা ওজন হবে সেই ওজনের কড়া পাকের সন্দেশ খাওয়াতে হবে—পারবেন ?'

সতু বদ্যির গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে যায়, তবে দুটো চোখের কোণ দিয়ে চোরা হাসি ঠিকরে বেরোতে থাকে।

ওরা দুজনেই হাসে, ভীরু লাজুক হাসি।

সতু বদ্যির কপালটা সত্যিই ভালো, মেয়েটির রক্তের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তার মানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সিফিলিসের চিকিৎসা করতে হবে। আর তাহলে ওদের সুস্থ সজীব সন্তান হওয়াতে আর কোন বাধাই থাকবে না।

চিকিৎসা ? খুব সোজা। দু-সপ্তাহ ধরে পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শান—ব্যস। তবে সতু বদ্যি একটু বেশী সাবধানী, সিফিলিসের ক্রিয়া তো বিশ বছর পঁচিশ বছর পরেও হতে পারে। আর পেনিসিলিন আবিষ্কারই হয়েছে দশ বছর হল। সুতরাং পেনিসিলিনেরও আগে যে চিকিৎসা ছিল—আর্সেনিক আর বিসমাথ সে ইন্‌জেকশানও দিয়ে দেওয়া ভালো, অন্তত কিছুটা।

আর সতু বদ্যির মেজাজও ভালো। বিফল ব্যর্থ-মনোরথ এই দম্পতিকে তাদের জীবনের পথে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনার পথে এগিয়ে দিতে পারে সতু বদ্যি—তার কাঁচের সিরিঞ্জ আর ইস্পাতের সূঁচ। সতু বদ্যির নিজেকে বিধাতা পুরুষের মত শক্তিশালী মনে হয়।

আর তা ছাড়া পেনিসিলিনও এখন সস্তা হতে হতে এমন পর্যায়ে এসে পৌচেছে যে, এই সব কারখানার মজুরদের পক্ষে ও চিকিৎসা করা মোটেই অসম্ভব নয়।

চিকিৎসা চালিয়ে যায় সতু বদ্যি। তেমনি খুশিতে আর মেজাজে টগ্‌বগ্‌ করে সতু বদ্যি।

'কড়া পাকের সন্দেশ তো খাওয়াবেন বললেন, কিন্তু কিনবেন কি করে ?' ইন্‌জেকশান্ দিতে দিতে আবার একদিন সতু বদ্যি জিজ্ঞেস করে।

'কেন দোকান থেকে', এতদিনে মেয়েটি একটু কথা বলে।

'দোকানে গেলেই আসল কড়া পাক মিলবে ? চিনতে হবে না ?'

'ভালো দোকানে যাব—ধরুন গিরিশের........' মেয়েটির স্বামী এবার এগিয়ে আসে স্ত্রীর সাহায্যে।

'আর তোমার চাঁদবদনটি দেখে খাঁটি জিনিসটি এগিয়ে দেবে তাই না ? অতই সোজা কিনা ?' সতু বদ্যি খেঁকিয়ে ওঠে।

'তা হলে?' দুজনেই এবার বুঝতে পারে সন্দেশ—বিশেষ করে খাঁটি কড়া পাকের সন্দেশ—চেনা অত সোজা নয়।

'শুনুন—সন্দেশ তো কড়া পাকের আপনাকে দিল....' সতু বিদ্দি এবার সন্দেশ কেনার রীতি বোঝায়।

'একটি সন্দেশ নিয়ে ছুঁড়ে মারবেন ঠিক দোকানদারের কপালে, যদি তার কপালে ফুলে একটি গুলি ওঠে তাহলে বুঝবেন কড়া পাকের সন্দেশ। আর যদি সেই গুলি অন্ততপক্ষে আপনার সন্দেশের মত বড় হয় তাহলে বুঝবেন ওটা আসল কড়া পাক,—কিন্তু খবরদার—কপাল যেন না ফাটে........'

হাসিতে ফেটে পড়ে ওরা দুজনেই। সতু বিদ্দির কথা আর শেষ হয় না। আরও গম্ভীর হয়ে যায় সতু বিদ্দি।

'আচ্ছা প্রথম আপনাদের কি চাই—ছেলে না মেয়ে?' সতু বিদ্দির আর একদিনের প্রশ্ন। এই ক-দিনেই যেন সতু বিদ্দি হয়ে গেছে ওদের পরমাত্মীয়। ওদের তো শুভাশুভের বিধাতা পুরুষ এখন সতু বিদ্দিই। ওর ওই যাদু দণ্ডের মত সিরিঞ্জ দিয়ে ও ফুটিয়ে তুলবে এদের সংসার মরুভূমিতে শিশুর কাকলী।

'মেয়ে—ডাক্তারবাবু। মেয়ের নাম অবধি ঠিক হয়ে গিয়েছে।' স্বামীর কথায় লজ্জা এখন অনেক ভেঙেছে।

'বটে? কী নাম?'

'চাঁপা', স্বামীর নির্লজ্জ ব্যবহারে মেয়েটি ক্রমশই মাথা নোয়াতে থাকে।

'হবে তো একটা কেলে কিস্কিন্দি মেয়ে তার আবার নাম চাঁপা, নাম রাখবেন স্বরুংকালী,' সতু বিদ্দি খেঁকিয়ে ওঠে।

'কেন? আমার মেয়ের নাম স্বরুংকালী হবে কেন? নিজের মেয়ের নাম তাই রাখবেন', মেয়েটির নুয়ে যাওয়া মাথা সোজা হয়ে ওঠে।

এমনি করে দু-সপ্তাহ কেটে যায়; রোজ সিরিঞ্জ ভর্তি পেনিসিলিন ইন্জেক্শান নেয় ওরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই, এইবার শুরু হয় আর্সেনিক আর বিসমাথ ইন্জেকশান, এগুলোকে ডাক্তারী ভাষায় বলে ভারী ধাতু। এগুলো ইন্জেকশান দেয়া একটু বিপদজনক, এগুলো শরীর থেকে বেরোবে মূত্রগন্থি দিয়ে। যদি মূত্রগ্রন্থিতে কোন খুঁত থাকে তাহলে হয়তো সমস্ত মূত্রতন্ত্রই বিকল হয়ে যেতে পারে। আরও কত যে বিপদ হতে পারে তা একমাত্র সারাদিন রোগী ঘাঁটা সতু বিদ্দিই বলতে পারে।

সপ্তাহে একদিন বিসমাথ—সেদিন মাংসপেশীর ভিতরে ইন্জেকশান (ইন্ট্রা

মাসকিউলার) তাতে হাঙ্গামা কম, কিন্তু যেদিন আর্সেনিক—শিরার ভিতরে ইন্‌জেকশান (ইন্ট্রা ভেনাস) সেদিন ভারী মুশ্‌কিল। সকালবেলা কিছুই না খেয়ে খালি পেটে আসতে হয় তাদের। ইন্‌জেকশান দেয়া হয়ে গেলে তবে বাড়ি গিয়ে খাওয়া।
'সন্তানের জন্যে উপোস করে ব্রত করছি।' মেয়েটি ভাবে—পরম কারুণিক বিধাতাপুরুষের মত সতু বগ্যিই যেন তার ব্রতের দেবতা।

'একবার এখনই চলুন ডাক্তারবাবু', লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে, সেই মেয়েটির স্বামী।
'কী হয়েছে ?'
আজ সকালে ভোরবেলা মেয়েটি যখন ঘুম থেকে উঠেছে তখন গলাটা একটু সুড় সুড় করছিল, খুক করে কাশতেই মনে হল নোনতা নোনতা কি মুখে উঠে এল। বাইরে ফেলতে গিয়েই দেখে রক্ত। তারপর থেকে বারে বারেই খালি রক্ত উঠছে। ডাক্তারবাবুর একবার এখনই যেতে হবে।
ভয়ে আর উত্তেজনায় লোকটি ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, সতু বদ্যি কিন্তু ফ্যাকাশে হয় না। ভয় আর উত্তেজনা—তাও সতু বদ্যির অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মেয়েটির চিকিৎসা করেছে এতদিন। ফিও নিয়েছে, গুণে গুণেই নিয়েছে, একেবারে খদ্দের দোকানদার সম্পর্ক। কিন্তু তবুও মেয়েটির উপরে কি রকম মায়া পড়ে গিয়েছে সতু বগ্যির।
তবে ফ্যাকাশে সতু বগ্যি হয় না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ব্যাগ নিয়ে।
সাধারণ বস্তিবাড়ি, বিশেষত্ব কিছুই নেই। তবে বস্তিবাড়ি আর কোঠা বাড়ি সব বাড়িতেই সতু বগ্যি লক্ষ্য করেছে একটা জিনিস। প্রথম যখন ছেলে-মেয়েরা বিয়ে করে সংসার পাতে—আর সে সংসারে যদি শাশুড়ী না থাকেন তখন কেন যেন বাড়ি ঢুকলেই মনে হয় সেটা খানিকটা সংসার আর খানিকটা খেলা-ঘর। পুরোপুরি সংসার মনে হতে কিছুদিন সময় লাগে।
ওদের সংসারকেও যেন এখনও খেলা-ঘর ছুঁয়ে আছে। রক্ত যখন পড়ছে আর কাশির সঙ্গেই পড়ছে তখন কর্তব্য স্থির করার অবিশ্যি কোন মুশ্‌কিল নেই, কর্তব্য হল রক্ত বন্ধ করা। তারপর রক্ত বন্ধ হলে—পনেরো দিন পর তখন বুকের এক্সরে ইত্যাদি সব রকম পরীক্ষা করেই অবিশ্যি কারণ বার করতে হয়।

হয়েছে যক্ষ্মা রোগ, একটা ফুস ফুস ধরেছে, কোন গর্ত হয়নি, তবে যক্ষ্মা হয়েছে। এ ধরনের যক্ষ্মায় কিছু দিন ওষুধ আর ইন্‌জেকশান দিলেই সেরে যায়। একটু অর্থের প্রয়োজন, তা সে অর্থ সতু বগ্নিই আপাতত জোগাবে। পরে ওদের ক্ষমতা হলে ওরা শোধ করবে। রোগিনীর স্বামী এবার সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়ে। অনেক ডাক্তার সে জীবনে দেখেছে, কিন্তু এরকম ডাক্তার আর দেখেনি।

সতু বগ্নিও অভিভূত হয়ে পড়ে, ভারী ধাতু ইন্‌জেকশানের এও এক বিপদ। ভারী ধাতু মানে ওই যে আর্সেনিক বিসমাথ সতু বগ্নি দিয়েছিল সিফিলিসের জন্যে তার কথা বলা হচ্ছে। যদি সুপ্ত কিংবা অর্ধসুপ্ত যক্ষ্মা রোগ কোথাও থাকে তা হলে সে রোগ আবার চাড়া দিয়ে উঠতে পারে এই ভারী ধাতু ইন্‌জেকশানে। মেয়েটিরও তাই হয়নি তো? এক্সরে দেখে সতু বগ্নির সন্দেহ আরও বাড়ে, নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়।

আচ্ছা আগে এক্সরে করে নিলেই তো হত কিন্তু তাই কি সম্ভব। করবে সিফিলিসের চিকিৎসা আর পরীক্ষা করবে যক্ষ্মা রোগের? ধান ভানতে শিবের গীত?

আর তাছাড়া শুধু শিবের গীত গাইলেই হবে না, আরও তো কত রোগ হতে পারে। তাহলে তো তেত্রিশ কোটি দেবতারই গীত গাইতে হয়। গোটা মেডিসিন বইয়ে যা রোগ আছে সবই কি খুঁজে বেড়াবে এই বস্তিতে?

কিন্তু তবুও নিজেকে কি রকম অপরাধী মনে হয় সতু বগ্নির। সাক্ষাৎ বিধাতা পুরুষ সতু বগ্নি যেন রাতারাতি খুনের আসামী হয়ে যায়।

ইন্‌জেকশান চলে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, খেতে দেয়া হয় প্যাস (পি-এ-এস), ইন্‌জেকশান চলে লিভার এক্সট্রাক্ট, খেতে দেয়া হয় ভিটামিন বড়ি, আর রোগীরও উন্নতি হয় হু হু করে। এক মাসেই রোগীর রক্তশূন্যতা সেরে যায়, তারপর দু-মাস, তারপর তিন মাস।

আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। মেয়েটির শুকনো গাছে পাতাই শুধু গজিয়েছে তাই নয় ফুলও হয়েছে।

তিন মাস বাদে যখন প্রথম সতু বগ্নি ওকে হাঁটতে দিল—দশ বছর ডাক্তারী করা সতু বগ্নি যেন চমকে উঠল সে রূপ দেখে। সেই শুকনো ফ্যাকাশে মেয়ে কি এই।

উঠোনের সস্তা মরসুমী ফুলের গাছের ভিতর দিয়ে যখন সতু বস্থিকে এগিয়ে দেয় মেয়েটি সতু বস্থি ভুলে যায় মেয়েটি কালো, ভুলে যায় এটা কোন ঋষির আশ্রম নয়—

মনে হয় পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকানম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

এ যেন পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকের ভারে আনত হয়ে একটি পল্লবিনী লতা চলে বেড়াচ্ছে।

নিজের সৃষ্টিতে বিধাতা পুরুষ আবার উল্লসিত হয়ে ওঠে।

'আর ক-মাসেই আপনি একদম সেরে উঠবেন।' সতু বস্থি ভরসা দেয়।

'এ রোগ কি সম্পূর্ণ সারে?' মেয়েটির সন্দেহ যায় না।

'কেন সারবে না?' সতু বস্থির অসীম ক্ষমতা, 'আগে সারতো না, এখন আমাদের বিজ্ঞান সব পারে, আপনি যে শুধু সুস্থই হয়ে উঠবেন তাই নয়, সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষ হয়ে উঠবেন। আপনি সাধারণ মানুষের মত খাবেন। তাদের মতই কাজ করবেন। সাধারণ লোকের মতই আপনি গৃহিণী হবেন,—মা-ও হবেন,' অসীম আত্মবিশ্বাস নিয়ে সতু বস্থি কথা শেষ করে।

মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। খুশিতে? লজ্জায়?

কিন্তু এবার? এবার সতু বস্থি কি করবে? এত বড় জাত বস্থি—সে কোন রাস্তা খুঁজে পায় না। এক একবার সমস্যাটা ভাবে আর আরও দিশেহারা হয়ে পড়ে।

কি ব্যাপার?

সেই যে পল্লবিনী লতা। সেই লতার ফল ধরেছে! অর্থাৎ সতু বস্থির রোগিনীর সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে। ব্যাপারটা অতি সাধারণ। কিন্তু........। আগে ধারণা ছিল যক্ষ্মারোগীর সন্তান সম্ভাবনা হলে রোগিনী আর তার ভবিষ্যৎ সন্তান দুজনেই বিপদগ্রস্ত হবে। সুতরাং সম্ভাবিত সন্তানকে নষ্ট করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু তারপর অনেক গবেষণা হয়েছে। যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসারও অনেক উন্নতি হয়েছে, এখনকার বৈজ্ঞানিক মত যক্ষ্মারোগের সঙ্গে সন্তান সম্ভাবনার কোন বিরোধ নেই। যদি সন্তান জন্মালে তখুনি সন্তানকে আলাদা করে নিয়ে ভালভাবে পালন করা যায়, যদি প্রসবের আগে আর পরে প্রসূতি

সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা করা যায়—তা হলে সন্তান কিংবা মায়ের স্বাস্থ্যের সন্তান-সম্ভাবনার দরুন কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু মুশকিল হল ওই দুটো যদি নিয়ে। কোথা থেকে সতু বগ্মি করবে বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা বস্তির এই ফিটার মেকানিকের জন্যে? আর কে পালন করবে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তার ভবিষ্যৎ সন্তানকে?

তা হলে? তা হলে কি সতু বগ্মি নষ্ট করে ফেলবে রোগিনীর সন্তান সম্ভাবনা? কিন্তু তাতেও অনেক অসুবিধা। সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট করার অস্ত্রোপচার দু-রকম হতে পারে—আইনী আর বে-আইনী।

সতু বগ্মি ছাড়া আরও দুজন ডাক্তারের অপারেশন করার উপদেশ নিতে হবে। তাঁদের দুজনেরই ডাক্তারী জীবন সতু বগ্মির চাইতে দীর্ঘ হতে হবে। আর তাঁদের ভিতর একজনকে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ হতে হবে।

তা হলে অপারেশন আইনসঙ্গত বলে গণ্য হবে।

কিন্তু ডাক্তারী বিজ্ঞান অনুসারে গর্ভনষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং অন্য ডাক্তার সম্মতি দেবেন না।

এ ছাড়া হতে পারে বে-আইনী অপারেশন। কলকাতা শহরে অনেকেই আছেন যাঁরা এই কাজ করে যথেষ্ট রোজগার করেন। তাঁদের দু-এক জনকে সতু বগ্মিও চেনে। যাবে তাদের কাছে?

কিন্তু তাদের যে অনেক টাকা দিতে হবে। তা হলে?

তাইতে কেলে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, 'পারবি না ভাই? বেহুঁশ করার জন্যে নাকে ইথার আমি ঢালব, পারবি না চেঁচে দিতে? সবে আট সপ্তাহ হয়েছে, কোন অসুবিধা হবে না তোর।'

তাকিয়ে থাকে কেলে ডাক্তারের মুখের দিকে উত্তরের আশায়।

কেলে ডাক্তার ভাবে, বড় কঠিন সমস্যা।

সতু বগ্মি যেন বিশ্বরূপ দেখে কেলে ডাক্তারের মুখে।

দেখে কালো রোগা লম্বা মেয়ে। দেখে গোলাপী রঙের শাড়ী, কালো গায়ের রঙ, সাদা শাঁখা, লাল সিঁদুরের টিপ আর কালো কাজলের রেখা।

দেখে সন্তানের জন্য ব্রতচারিনী—অভুক্ত আর্সেনিক ইন্‌জেকশান প্রার্থিনী কালো মেয়ে, দেখে অসীম ক্ষমতাশালী বিধাতা পুরুষের মত সিরিঞ্জ হাতে সতু বগ্মি। দেখে পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে নম্র-সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত কালো মেয়ে।

বুকের রক্ত

রবারের নলে লাগানো স্ঁচটা এসে হাতের ভিতরে রক্তের শিরায় ঢুকেছে। নলের আর একটা প্রান্ত উপরে বোতলে গিয়ে শেষ হয়েছে। পুরো নলটাই রবারের। কেবল মাঝখানে খানিকটা কাঁচ। সতু বক্সি গুম হয়ে তাকিয়ে আছে ঐ কাঁচের দিকে। কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা যায় রক্ত পড়ছে—টপ্ টপ্ টপ্ টপ্! ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত। মিনিটে ২৪ ফোঁটা টকটকে লাল তাজা রক্ত। উপরের বোতল থেকে এসে রোগিনীর শিরায় গিয়ে তার রক্তে মিশছে। ফোঁটা ফোঁটা লাল তাজা রক্ত।

তাকিয়ে তাকিয়ে অবসন্ন সতু বক্সিও মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

এ রক্ত সতু বক্সির নিজের রক্ত। বুকের তাজা রক্ত।

চলমান রক্তস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবসন্ন হয়ে সারাদিনের ক্লান্তিতে সতু বক্সি ঝিমোয়।

আধো জাগা আধো ঘুম অবস্থায় সতু বক্সির সামনে ওই চলমান রক্ত-স্রোতের ভিতরে সতু বক্সি যেন ছায়ার মত দেখতে পায় গত দু-মাসের ইতিহাস।

অবসন্ন পরিশ্রান্ত সতু বক্সির সামনে দিয়ে যেন ছায়াবাজি চলতে থাকে।

দু-মাস আগের কথা। সকাল আটটা থেকে একটি লোক সস্ত্রীক সতু বক্সির রোগীদের বসবার ঘরে অপেক্ষা করছে। তাদের আগে আর মাত্র এক-জন উপদেশ-প্রার্থী এসেছেন সতু বক্সির কাছে। সুতরাং তারপরই তাদের সতু বক্সির সঙ্গে দেখা করবার পালা। কিন্তু সতু বক্সির সাঙ্গোপাঙ্গা যতবারই এসে অনুরোধ করে সতু বক্সির সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে তত বারই লোকটি পরম বৈষ্ণবের মত বলে তার দেখা করবার পালা সবার শেষে।

শেষ পর্যন্ত সকাল গড়িয়ে যখন প্রায় দুপুর হয়—বেলা যখন এগারটা বেজে গিয়েছে তখন এসে তারা ঢোকে সতু বক্সির খাস কামরায়।

সামনে আর পাশে বসবার দুটো চেয়ার সতু বদ্যি দেখিয়ে দেয়। নিজে চওড়া চেয়ারটাতে আরাম করে বসে বলে, 'বলুন।'

'বলুন' বলতেই অবশ্য কথা বের হয় না। অনেক সঙ্কোচ অনেক লজ্জা কাটিয়ে লোকটি তার সমস্যা সতু বদ্যির সামনে তুলে ধরে।

লোকটি থাকে বস্তিতে। সতু বদ্যির ডাক্তারখানা থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। বলতেই সতু বদ্যি অবশ্য চেনে বস্তিটা। লোকটি কারখানায় কাজ করে। নাম শুনেই বোঝা যায় সে জাতে বাঙালী ব্রাহ্মণ। সবসুদ্ধ তার মাসিক রোজগার প্রায় ১১০ টাকা—মাইনে ওভারটাইম অ্যালাউন্স সব মিলিয়ে। বাড়িতে আছে স্বামী, স্ত্রী, দুটি ছেলে মেয়ে আর বৃদ্ধা মা। খুব কষ্টে সংসার চলে। এক বছরের ছেলের দুধ জোটে না। বৃদ্ধা মায়ের অম্বুবাচীর ফল জোটে না। আর ওদের স্বামী-স্ত্রীর কথা না বলাই ভালো। এখন সমস্যাটা হল স্ত্রীর আবার সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে। এই অবস্থায় আবার সন্তান? সতু বদ্যি যদি কোন বন্দোবস্ত করতে পারে। যাতে করে এবার অন্তত সন্তান হওয়াটা বন্ধ করা যায়। লোকটি জানে সবই। সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট করা যে ধর্মতঃ পাপ তা জানে। ডাক্তারের কাছে এ রকম অনুরোধ করা যে ঠিক সঙ্গত নয় তাও জানে। ওরা জাতে ব্রাহ্মণ। ওদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ আগে ছিল না। ওদের অনেক আত্মীয় স্বজনের অবস্থা এখনও বেশ স্বচ্ছল। কিন্তু কপালদোষে ওদের অবস্থা এখন এতই দরিদ্র হয়ে পড়েছে যে এ রকম অনুরোধ বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে।

এত কথা না বললেও অবিশ্যি সতু বদ্যি বুঝতে পারত যে জাত মজুর ও নয়। কারণ মানুষ ঘেঁটে সতু বদ্যি খায়। কিন্তু কী করে বুঝত?

লোকটির স্ত্রীর গৌরবর্ণ দেখে?

লোকটির কথা বলার ধরনে?

না তা নয়। সতু বদ্যি তো জাত বদ্যি। মজুর দেখেই ও বুঝতে পারে ও মূষিকবৃদ্ধি না গজক্ষয়।

মূষিকবৃদ্ধি আর গজক্ষয় জানেন না?

শুনুন তবে।

এক গাঁয়ে একবার এক বুনো শুয়োর ধরা পড়েছিল। সে গাঁয়ের কেউ আর এর আগে বুনো শুয়োর দেখেনি। সবাই অবাক। এ আবার কি

জানোয়ার ? কেউই বলতে পারে না। শেষে খবর দেওয়া হল গাঁয়ের চাঁই মশাইকে। চাঁই মশাই-এর ভারি বুদ্ধি। মাথা থেকে পা অবধি বুদ্ধিতে গজগজ করছে। পাছে বুদ্ধি বেরিয়ে যায় সেই ভয়ে তিনি নাকে কানে ছিপি এঁটে বসে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন।. নাকের ছিপি খুললেন। কানের ছিপি খুললেন। সামনে থেকে দেখলেন। পিছন থেকে দেখলেন। ডানদিক থেকে দেখলেন। বাঁদিক থেকে দেখলেন। উপর থেকে দেখলেন—নীচু হয়ে দেখলেন। এমন কি খুঁচিয়েও দেখলেন।

শেষে বললেন 'হুঁ, হয়েছে।' সবাই বললে 'কি হয়েছে চাঁই-মশাই, কি হয়েছে ?' চাঁই মশাই বললেন 'এ হল—হয় মূষিকবৃদ্ধি না হয় গজক্ষয়। অর্থাৎ কিনা হয় কোন হাতী, ছোট হয়ে গিয়েছে আর না হয় কোন ইঁদুর বড় হয়ে গিয়েছে।'

সতু বণ্ডি তেমনি মজুরদের ছুটো ভাগ করেছে। এক মূষিকবৃদ্ধি। অর্থাৎ যারা হয়তো গাঁয়ে গরীব ক্ষেত মজুর ছিল কিংবা জমিছাড়া চাষী ছিল—এখন শহরে এসে মজুর হয়েছে। তারা নিজেদের কিংবা পূর্বপুরুষদের কারও জীবনেই সচ্ছল অবস্থা দেখেনি। এরা একটু কাঠখোট্টাও বেশী হয় আবার নিজেদের দারিদ্র্যের জন্যে অত লজ্জিতও হয় না।

আর আরেক রকম হল গজক্ষয়। এরা আসলে ছিল মধ্যবিত্ত। এখন হয়েছে মজুর। এদের কথায় চালচলনে একটু পালিশ থাকে। এদের দারিদ্র্যে এরা লজ্জিতও হয় বেশী। জীবনযাত্রার মানও এরা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় আপ্রাণ।

তাইতে অনুরোধ শুনেই সতু বণ্ডি বুঝতে পেরেছিল এ হল গজক্ষয়।

এবার সতু বণ্ডি বোঝায় তার নিজের বক্তব্য। ডাক্তারী শাস্ত্রে এমন কোন খাবার ওষুধ কিংবা ইন্‌জেকশান নেই যা মানুষের সন্তান সম্ভাবনা হলে —সে সম্ভাবনা নষ্ট করতে পারে। সুতরাং এর বিহিত হতে পারে ছু-রকম। প্রথমতঃ, সন্তান সম্ভাবনা যাতে না হয় আগে থাকতেই সেরকম কোন ব্যবস্থা করা। আর দ্বিতীয়তঃ, সন্তান সম্ভাবনা একবার হলে তার বন্দোবস্ত একমাত্র অপারেশন-অস্ত্রোপচার।

এ অপারেশন খুব ছোটও নয় আবার খুব বড়ও নয়। একে মেজ অপারে-শন বলা যেতে পারে। কিন্তু এ অপারেশনের সবচাইতে বড় অসুবিধা

হল—এ অপারেশন আইন-বিরোধী। আর তাছাড়া মানুষ বাঁচানোর চেষ্টা করাই সতু বল্থির পেষা—মানুষ মারা নয়। সে অনাগতই হোক আর আগতই হোক।

সুতরাং সতু বল্থির উপদেশ হল এই: এবার সন্তানকে হতে দেওয়া হোক—তারপর ভবিষ্যতে যাতে আর সন্তান না হয় সে সম্বন্ধে সতু বল্থি যতদূর সম্ভব সাহায্য করবে।

কিন্তু ওরা কিছুতেই এ উপদেশ বিশ্বাস করে না। ওরা বিশ্বাসই করে না যে বিধাতা পুরুষের মত শক্তিমান সতু বল্থির শাস্ত্রে কোন ওষুধই নেই। ওরা বিশ্বাস করে না বে-আইনী অপারেশন বিপদজনক। ওরা বিশ্বাস করে না অনাগত সন্তানকে হত্যা করা—আগামী জীবনকে দারিদ্র্যে তিল তিল করে নষ্ট করার চাইতে অনেক বেশী নীতি বিগর্হিত।

শেষে সতু বল্থি দেয় তার শেষ উপদেশ। কলকাতা শহরে এ রকম অনেক ডাক্তার আছেন যাঁরা এরকম ব্যাপারে সাহায্য করেন। তাঁরা পাশ করা ডাক্তার নন। কিন্তু প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। কিন্তু তাঁদের কাছে গেলে জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা আছে। সেটা যেন ওদের মনে থাকে।

সতু বল্থি ফি নেয় না।

ওরা চলে যায়।

ওরা আবার আসে কয়েক দিন পর। ছোট বাচ্চাটার পেটের অসুখ হয়েছে। খালি পায়খানা করছে জলের মত। শিশুদের পেটের অসুখ বড় বিপদজনক হয় এক এক সময়।

সতু বল্থি ওকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। এক শিশু হাসপাতাল থেকে আর এক শিশু হাসপাতাল। ট্যাক্‌শির ভাড়া গোনাই সার হয় কিন্তু সীট আর পাওয়া যায় না। এই পেটের অসুখটা সতু বল্থি চেনে। কোন একটা বীজাণু থেকে এ হয়। বীজাণুর বিষক্রিয়ায় যে পায়খানা হয় তাতে শরীর থেকে জল বেরিয়ে শরীর হয়ে যায় জলশূন্য। তাইতে এর চিকিৎসার নিয়ম হল একদিকে যেমন বীজাণু নষ্ট করবার ওষুধ দেয়া তেমনি অন্যদিকে শরীরের জলের অভাব পূর্ণ করা। এই জল ঢোকাতে হয় শিরার ভিতরে।

হাসপাতাল ছাড়া তা দেবেই বা কি করে?

কিন্তু দমবার পাত্র সতু বল্থি নয়। নিজেই স্যালাইন দেয় আর খেতে দেয় সালফাগুয়ানিডিন।

তাতে সারে না।

আবার স্যালাইন দেয় আর খেতে দেয় স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন।

তাতে সারে না।

আবার স্যালাইন দেয়। এবার খেতে দেয় টেরামাইসিন।

এবার সারে।

সতু বিশ্বির লক্ষ্য কিছুই এড়ায় না। শিশুর পেটের অসুখও সারল আর মায়ের গলার সরু হারটাও গেল।

তা যাক। একটা মানুষের জীবন আর একটা সরু সোনার হার। দামের তুলনা হয়। ছোঃ।

সতু বিশ্বি এবার তার পাওনা ফি বুঝে নেয়।

তারপর দেখা আজ সকালে। খুব ভোরে। যাকে বলে কাক ভোর। কাক ভোর কাকে বলে জানেন না? তবে শুনুন খনার বচন—

> ডাকে কাক না ছাড়ে বাসা।
> সেই সে প্রকৃত ঊষা॥
> উড়ে পড়ে খায় না।
> তবু কেন যায় না॥

সেই ভোরে ডেকে তুলেছে সতু বিশ্বিকে। তখন কাকই ময়লা খায়নি তো সতু বিশ্বি কি করে চা খাবে। তাইতে ঝিমুতে ঝিমুতে ব্যাগটা নিয়ে বস্তিতে এসে হাজির হয়।

বাইরে তখনও ঘুম ভাঙেনি ছেলে দুটোর। ঘুমিয়ে আছে বারান্দায় ছেঁড়া মশারি আর তার উপরকার ছেঁড়া শাড়ীর ঢাকনা সবসুদ্ধ জড়াজড়ি করে। বাসী কলাই করা বাসনগুলো পড়ে আছে বারান্দার কোণে তোলা উনুনটার পাশে। বস্তির সকাল বেলার গন্ধ, নোংরা কাপড়ের গন্ধ, বাসী বাসনের গন্ধ এততেও ঘুমের ঘোর কাটে না সতু বিশ্বির।

সতু বিশ্বি ঝিমোয়।

লক্ষ্যও করে না লোকটার অপরাধী চোরের মত চালচলন।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে হঠাৎ বোঁট্‌কা গন্ধে সতু বিশ্বির ঘুম ছুটে যায়।

সামনে শুয়ে আছে অসংবৃত কাপড়ে ২১।২২ বছরের বউটি। লণ্ঠনের আলোতেও তার অসম্ভব ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখ সতু বিশ্বির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চাটাইয়ের বিছানার চার পাশে চাপ চাপ জমে আছে মানুষের বাসী রক্ত।

বাসী রক্ত আর রোগা মানুষ সব মিলিয়ে বোটকা গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে আছে।

উঁচু হয়ে বসে সতু বিশ্বিকে নাড়ী দেখতে হয়। নাড়ীর গতি এত ক্ষীণ যে গোনা যায় না—মনে হয় আঙুলের চাপেই চুপসে যায়।

এইবার স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয় হৃৎপিণ্ড। ওর নিরাভরণ দেহ আর নিরাবরণ বক্ষ। ফর্সা রঙ্ রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে হাতীর দাঁতের মত সাদা দেখায়। নিরাবরণ বক্ষের বর্ণনা কবি হলে দিতে পারত। হয়তো বলত—নারীর সৌন্দর্যে হেরে গিয়ে কামদেব লজ্জায় তার জয় দুন্দুভি ওর বুকে রেখে পালিয়ে গেছে।

কিন্তু সতু বিশ্বি হল মিস্ত্রী। ও বোঝে এ বক্ষ-চিহ্ন আসলে ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্যে প্রস্তুতি। সতু বিশ্বি তার স্টেথোস্কোপ বসায়।

জীবনের লক্ষণ বর্তমান।

তারপর দেখে আরও নীচে, ফ্যাকাশে লালচে রক্ত তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে।

সতু বিশ্বি বুঝতে পারে নতুন জীবন তো আর আসতে পারল না। তাইতে কান্নার মত চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে মায়ের জীবন।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সতু বিশ্বি উঠে বসে। 'কে করেছে—বলুন শীগগির বলুন।' বলে স্বামী।

একজন কবিরাজ করেছে। পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে। বলেছে এ অপারেশনের পর একটু রক্তস্রাব হতে পারে। একটু ব্যথাও হতে পারে। তাতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। অন্য কোন ডাক্তার ডাকবারও কোন প্রয়োজন নেই।

কাল মাইনে পেয়েছিল। কাল মাস পয়লা ছিল কিনা। কবিরাজের কাছ থেকে অপারেশন করবার পর এসে রান্নাও করেছে। ছেলেরা ও মাসে লাল দই খেতে চেয়েছিল। দই দিয়ে তাদের কাল ভাতও খাইয়েছে কিন্তু রক্তস্রাব ক্রমশই বেড়েছে। তারপর সকালবেলা ও সামান্য কার-খানার শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারে যে ওর খোকার মা মৃত্যুপথযাত্রী। তাইতে ও ছুটে গিয়েছে সতু বিশ্বির কাছে।

সতু বিশ্বির দেহে যেন হঠাৎ আসুরিক ক্ষমতা আসে। আসে মত্ত হস্তীর বল।

'এখখুনি ট্যাক্শি ডাকুন' হুকুম হয় স্বামীকে।
ইন্জেকশান দেয়া হয় এ্যাট্রগিন, মরফিন আরও কত কি।
ট্যাক্শি এসে পৌছোয়। সতু বক্সি হাঁক দেয় স্বামীকে—আসুন তুলতে হবে ট্যাক্শিতে। স্বামী কি রকম ভয় পায়, ইতস্তত করে। অপেক্ষা করার কিন্তু সময় তখন আর নেই। অগত্যা সতু বক্সি নিজেই কোলে তুলে নেয় বউটিকে।
একুশ বছরের পূর্ণ-যৌবনা মেয়ে। একুশটি বসন্ত পেরিয়ে বেরিয়ে আসে সতু বক্সির কোলে—বিবস্ত্রা, দিগম্বরী। সতু বক্সির ডানহাতের তলা দিয়ে এসে মাটি ছুঁয়েছে তার ঘনমেঘের মত একরাশ চুল। বাঁ হাতের তলা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে রক্ত। সতু বক্সির মাখন জিনের প্যাণ্ট আর বিলেতি পপ্লিনের শার্ট লাল হয়ে ওঠে রক্তে।
'একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে পারো না, উল্লুক।' সতু বক্সি গর্জন করে ওঠে।
থতমত খেয়ে স্বামী বউয়ের গায়ের উপর ফেলে দেয় একটা পুরনো বিছানার চাদর।
তারপর এই হাসপাতাল।
তারপর ব্লাড ব্যাঙ্ক।
কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দেয় কে? ওই হতভাগা স্বামীকে পরীক্ষা করে ব্লাড ব্যাঙ্কের ডাক্তার বলে তার রক্ত চলবে না।
অগত্যা সতু বক্সিই শুয়ে পড়ে টেবিলে।
তারপর আবার হাসপাতাল।
ইতিমধ্যে হাসপাতালের ডাক্তার বের করে দিয়েছেন সেই অনাগত সন্তানের অবশিষ্ট অংশ।
তখুনি শুরু করে দেয়া হয় রক্ত দেয়া।
নাড়ীটা দেখে সতু বক্সি আশ্বস্ত হয়। ওয়ার্ডের নার্স একটা টুল এগিয়ে দেয়। অবসন্ন হয়ে সতু বক্সি বসে পড়ে।
বসে বসে গোনে, রক্তের ফোঁটা পড়ছে টুপ্ টুপ্ টুপ্ টুপ্! টকটকে লাল রক্ত। সতু বক্সির বুকের রক্ত।
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত টুপ্ টুপ্ করে এসে শিরা দিয়ে মিলিয়ে যায় রোগিনীর দেহে।

সতু বস্থি—পরিশ্রান্ত, অবসন্ন সতু বস্থি—ঝিমোয়।
আর ঝিমোতে ঝিমোতে জ্বলে ওঠে এক একবার।
কেন সতু বস্থি রক্ত দেবে? তার নিজের বুকের রক্ত। তাজা লাল রক্ত?
কিন্তু কার রক্ত হলে সতু বস্থি খুশি হয়?
ওই নির্বোধ স্বামীর রক্ত?
সেই খুনী কবিরাজের রক্ত?
না ওই মূর্খ আইন যারা করেছে তাদের রক্ত?
আবার ঝিমিয়ে পড়ে সতু বস্থি। ঝিমোতে ঝিমোতে পরিশ্রান্ত সতু বস্থি স্বপ্ন দেখে। যদি পালিয়ে যেতে পারে সতু বস্থি, এমন কোথাও যেখানে কোন শিশুই অবাঞ্ছিত নয়। যেখানে নেই শিশুহত্যা, নেই ভ্রূণহত্যা। যেখানে নেই নারী হত্যা। নেই মাতৃহত্যা।
যেখানে নবাগত শিশুকে স্বাগত জানাবে সবাই। সতু বস্থিকে নিমন্ত্রণ করবে শিশুর জন্মদিনে অন্নপ্রাশনে। খেতে দেবে পায়েস মিষ্টান্ন। দায়িত্ব তুলে নেবে শিশুর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের—তার জীবনের।
যেখানে সতু বস্থিকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না—নিজের বুকের রক্ত দিয়ে—অন্যের পাপের।
সতু বস্থি ঝিমোয়।

?

প্রশ্ন

চামড়া, স্প্রিং আর কাঠ দিয়ে নকল পা-টা তৈরি, লাগাতে হয় হাঁটুর উপরে। হাঁটু অবধি তো কেটে বাদ দেয়া হয়েছে তাই বাকিটা তৈরি করতে হল—চামড়া, স্প্রিং আর কাঠ দিয়ে।

নকল পা-টা বেশ ভালো করে লাগিয়ে ফিতে-টিতেগুলো এঁটে দিল। তারপর লোকটি পরলো একটা চুস্ত পায়জামা—পায়ে দিল জুতো আর গায়ে দিল হাঁটু অবধি ঝোলানো পাঞ্জাবী।

তারপর তার হাতে একটা ছড়ি দিয়ে সতু বক্সি বললো, 'দাঁড়াও।'

লোকটি দাঁড়ালো, ঠিক ভালো করে দাঁড়াতে পারে না—তবে হাতে ছড়িটা থাকাতে ছড়ির উপরে ভর করে মোটামুটি দাঁড়ায়।

তারপর সতু বক্সি লোকটিকে ভালো ভাবে নিরীক্ষণ করে।

সামনে থেকে দেখে, পিছন থেকে দেখে। ডানদিক থেকে দেখে, বাঁদিক থেকে দেখে; হাঁটিয়ে দেখে, দাঁড় করিয়ে দেখে; বসিয়ে দেখে, শুইয়ে দেখে………।

না একদম ঠিক হচ্ছে না। কাঠের পা-ওয়ালা পা-টা কি রকম একটু বেঁকে আছে। কি রকম যে বেঁকে আছে লিখে ঠিক বোঝানো যায় না।

হ্যাঁ, পা-টা দেখতে হয়েছে ঠিক যেন একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ঠিক এই রকম—?—। মানে ইংরেজিতে যাকে বলে নোট অফ ইনটেরোগেসন।

ঐ প্রশ্নবোধক চিহ্নের দিকে সতু বক্সি যত তাকিয়ে থাকে তত ঘাবড়িয়ে যায়। এই প্রশ্নের সমাধান সতু বক্সি কি করে করবে? এ তো সতু বক্সির একতিয়ারের বাইরে। অর্থাৎ কি না সীমান্তের বাইরে দাঁড়িয়ে সতু বক্সিকে কাঁচকলা দেখাচ্ছে ওই প্রশ্নবোধক চিহ্নটা। সীমান্তের বাইরে সুতরাং সতু বক্সি কিছু করতেও পারে না অথচ কাঁচকলাটা দেখাচ্ছে সতু বক্সিকেই সুতরাং অপমানটা ষোল আনা সতু বক্সিরই।

বলুন তো কী গেরো।

ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি কি বলেন ?

রুগী যে বাড়ি থেকে এসেছে—সেটা বস্তি বাড়ি। সেখানে সতু বদ্যির ভারী নাম ডাক। বস্তির লোকে বলে সতু বদ্যির নাকি সব জ্যান্ত ওষুধ—ডাকলে ডাক শোনে। বস্তির একটা কোণ দিয়ে থাকে হিন্দুস্থানীরা।

সেই হিন্দুস্থানীদের ভিতরে একজনের পিঠে একটা ফোড়া হয়েছিল। লোকটির বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে। কোন্ কারখানায় যেন কাজ করে। ফোড়াটা বেশ বড়। আর ফোড়াটা ছাড়াও সারা পিঠটাই লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। বেশ জ্বর, যথেষ্ট শারীরিক দুর্বলতা। পিঠ আর সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে লোকটি এসেছে।

শুধু তাই নয় লোকটির সবচাইতে খারাপ লক্ষণ হল তার আত্মবিশ্বাসের অভাব। তার অবিশ্যি কারণও ছিল। প্রায় বছর ত্রিশেক আগে এই পৃষ্ঠ-ব্রণতেই ওর বাবা মারা যান। তখন ওর বাবার বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশই হবে। গত বছরও এই পৃষ্ঠব্রণ ওর হয়েছিল। তখন একজন ডাক্তার অপারেশন করেছিলেন, ইন্‌জেকশনও দিয়েছিলেন। তাইতে সেরেও গিয়েছিল কিন্তু এক বছর পরেই আবার সেই একই জিনিস একই জায়গায়।

সতু বদ্যি ভালো করে রোগী পরীক্ষা করে। রোগীর প্রস্রাবও পরীক্ষা করে। না, বহুমূত্রজনি পৃষ্ঠব্রণ এ নয়। অবিশ্যি বহুমূত্রজনিত পৃষ্ঠব্রণ হলেও সতু বদ্যি ভয় পেত না।

ত্রিশ বছর আগে ওর বাবা পৃষ্ঠব্রণেই মারা গিয়েছিলেন। হয়তো সেটা বহুমূত্রজনিতই ছিল। কিন্তু এখন সেদিন চলে গিয়েছে অনেক পিছনে। তখন ইনসুলিনও আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং, তখন যে অসুখ ছিল ভেষজ (মেডিসিন) আর শল্যশাস্ত্রের (সার্জারি) মহা মহারথীদের কাছেও ভয়াবহ এখন সতু বদ্যির কাছেও তা জলভাত। যদিও সতু বদ্যি মহারথী তো নয়ই—রথীও নয় নেহাতই পদাতিক।

যাই হোক এই অসুখটাকে ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে ইন্‌ফেক্‌টেড সেবেসাস্ সিস্‌ট্‌ অর্থাৎ চামড়ার ঠিক নীচে অবস্থিত এরকম থলে দূষিত বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হলে এই রকম হয়। সাধারণ ফোড়ার সঙ্গে এই ফোড়ার চিকিৎসারও একটু তফাৎ আছে।

সাধারণ ফোড়ার চিকিৎসা হল প্রথমতঃ পেনিসিলিন দেয়া। তাতে ফোড়া

ছাড়া আশপাশের সমস্ত জীবাণুর সংক্রমণ মিলিয়ে যাবে। তারপর ফোড়াটাতে অস্ত্রোপচার করে পুঁজ বের করে দিলেই হাঙ্গাম মিটে যাবে।

কিন্তু এই সব ফোড়ায় শুধু পুঁজ বার করে দিলেই হয় না চামড়ার নীচে যে থলিটার ভিতরে পুঁজ জমা হয় সেটা সম্পূর্ণভাবে কেটে বার করে ফেলে দিতে হয়। তা না হলে বারে বারেই ওখানে পুঁজ জমে ফোড়া হতে থাকে। গতবারে ওর ফোড়ার চিকিৎসা হওয়া সত্বেও এইবার যে আবার হয়েছে তারও কারণ—ওই থলিটা।

তাইতে এইসব ফোড়ার চিকিৎসা সাধারণ ফোড়ার চাইতে একটু অন্য রকম। সতু বক্সিও যুক্তিসঙ্গত রাস্তাই নেয়। কয়েকদিন ধরে পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে তারপর অস্ত্রোপচার করে থলিটাকে তুলে ফেলে দেয়।

থলিটা তুলে ফেলে দিতে একটু দেরি হয় অবিশ্যি, প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগে। নোভোকেন ইনজেকশন দিয়ে চারপাশ অসাড় করে তারপর আস্তে আস্তে কেটে আস্তো থলিটা তুলে ফেলে দিতে হয়।

তবে দেরি হলেও কাজটা হয় খুব পরিষ্কার। জীবনে আর ও ফোড়া হবে না। আটদিন বাদে সেলাই কেটে দেয়া হলে—অবশিষ্ট থাকে খালি সরু চুলের মত একটা দাগ। এত বড় যে একটা ব্যাপার হয়েছিল—তার চিহ্ন শুধু ওই সরু দাগ। কাজটা সত্যিই খুব পরিষ্কার হয়েছে।

যাবার সময় লোকটি একটা অদ্ভুত ব্যাপার করে বসে। হঠাৎ একঘর লোকের মাঝে সতু বক্সিকে গড় হয়ে প্রণাম করে। 'আরে করো কি! করো কি!' বলে বাধা দিতে দিতেই তার প্রণাম করা হয়ে যায়। সতু বক্সির কথা কি আর সে মানে। তার মাথায় ঢুকে বসে আছে জিন্দিগী যখন সতু বক্সি বাপিস্ করেছে তখন সতু বক্সি নির্ঘাত দেওতা। এমন কি খোদ ভগবানও হতে পারে। প্রণাম সে করবেই।

কিন্তু সতু বক্সির খারাপ লাগে। প্রণামটা সতু বক্সির প্রাপ্য নয়।

সতু বক্সি হল সামান্য মিস্ত্রী—ড্রাইভার ক্লাসের লোক। তাকে শিখিয়েছে ডান দিকে কল ঘোরালে—গাড়ি ডান দিকে যাবে—কি বাঁ দিকে যাবে। সে সেই ভাবে কল ঘুরিয়ে চলেছে।

কিন্তু সেই সমস্ত ঋষি যাঁরা বিজ্ঞানকে নতুন পথ দেখিয়েছেন—সেই সত্য-দ্রষ্টা ঋষিরা অমৃতের পুত্রদের জন্যে পৃথিবীতে সত্যিকারের অমৃত আনয়ন করে প্রণম্য হয়েছেন। তাঁদের প্রাপ্য প্রণাম সতু বক্সি কি করে গ্রহণ করে?

সতু বন্দ্বি কি করে গ্রহণ করে পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর প্রাপ্য প্রণাম ? কি করেই বা গ্রহণ করে বীজাণুতত্ত্বের আবিষ্কর্তা লুই পাস্তরের প্রাপ্য প্রণাম আর জীবাণুবিহীন শল্যবিদ্যার আবিষ্কর্তা লর্ড লিস্টারের প্রাপ্য প্রণাম ?

সুতরাং, সতু বন্দ্বি একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করে। অপারেশন রুগীও শোনে আবার ঘরভর্তি লোকও শোনে।

'আমাদের বিজ্ঞানের এই যে উন্নতি—এর ফলে আজকে আমরা যে সব অসুখ সারাতে পারি আগেকার দিনের কোন যাদুকর কোন ধর্মগুরুও তা কল্পনা করতে পারতেন না। সেই জন্যে যে মনিষীরা এত বড় বড় আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের স্থান পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন ধর্মগুরু, যে কোন রাষ্ট্রগুরু কারও চাইতে নীচু নয়। অথচ দেখুন যাঁদের আবিষ্কারে দৈনন্দিন আপনাদের স্বাস্থ্য সুস্থতর সুন্দরতর হয়ে উঠছে তাঁদের আপনারা একবার মনেও করেন না। আপনারা খাতির করেন আমাদের। অথচ আমরা কি ? আমরা তো সামান্য মিস্ত্রী মাত্র।

'আপনারা মোটরগাড়ির ড্রাইভারকে খাতির করেন অথচ তাঁর আবিষ্কারককে একবার দিনান্তে মনেও করেন না।

'সেইজন্যেই এই প্রণামে আমি খুশি তো হইনি বরং লজ্জিতই হয়েছি। এ লজ্জা বিনয়ের লজ্জা নয় পরের পাওনা আত্মসাৎ করতে গিয়ে ধরা পড়লে চোর যে রকম লজ্জিত হয় এ সেই রকম লজ্জা।'

এত কথা বলা সত্বেও কিন্তু সে লোকটি সতু বন্দ্বিকে ভোলেনি। তাইতে ওদের বস্তিতে যখন দেশ থেকে দেশোয়ালী ভেইয়া এল আধখানা পা খুইয়ে তখন সে তাকে সতু বন্দ্বির কাছেই নিয়ে এসেছে। সে তো জানে সতু বন্দ্বি আসলে দেওতা। সতু বন্দ্বি সব পারে।

সতু বন্দ্বিও অবিশ্যি দায়িত্ব অস্বীকার করেনি। সব না হলেও অনেক কিছুই সতু বন্দ্বি পারে।

কাটা পা নতুন করে গজাবার বন্দোবস্ত অবিশ্যি সতু বন্দ্বি করতে পারেনি—কিন্তু সব চাইতে ভালো দোকান থেকে, সবচাইতে ভালো জিনিসপত্র দিয়ে নকল একখানা পা তাকে সতু বন্দ্বি ভালো করেই বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বানানোর পরে আবার সেই প্রশ্ন।

সেই যে প্রথমে বলা প্রশ্নবোধক চিহ্ন—সেই প্রশ্ন।

দেশে লোকটির জমিজমা আছে চাষবাস করে। ক্ষেত পরিষ্কার করছিল একদিন—আগাছা-টাগাছাগুলো পরিষ্কার করে যাতে ফসল ভালো হয় সেই চেষ্টা। হঠাৎ পায়ে কি একটা ফুটলো। ও প্রথমে গ্রাহ্যই করেনি। এ রকম তো কত ফুটছে। কিন্তু দিন দু-তিন বাদে জায়গাটা বেশ শক্ত হয়ে ফুলে উঠলো। চলতে ফিরতে অসুবিধা হয়। ওদের বাড়িতে পরামাণিক এসেছিল চুল দাড়ি বানাতে। ওর অনুরোধে ফোড়াটাও পরামাণিক কেটে দিয়ে গেল। ভিতরে একটা কাঁটা ছিল সেটাও বেরিয়ে গেল।

জায়গাটা পরিষ্কার করেছিল কি—কাটবার আগে?

পা-টা তেমন কিছু অপরিষ্কার ছিল না। দু-দিন তো মাঠেই যায়নি। পাও তাইতে নোংরা হয়নি।

যে নরুনটা দিয়ে কেটেছিল সেটা কি পরিষ্কার ছিল?

পরামাণিকের নরুন তো বেশ পরিষ্কার চকচকেই থাকে আবার কি পরিষ্কার করবে?

না—লর্ড লিস্টারের বীজাণুবিহীন শল্যবিদ্যা ওরা ঠিক জানে না।

কাঁটা তো বেরিয়ে গেল। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টা পর থেকেই পায়ে যেমন যন্ত্রণা হতে লাগল তেমনি পা ফুলে হয়ে উঠলো ঢোল। আর জ্বর। সে কী জ্বর। গা যেন মনে হয় পুড়ে যাচ্ছে। তখন ডাকা হল পরা-মাণিকদের ভিতর যে মুখিয়া লোক তাকে।

সে দেখে বলল—এ তো বিষ লেগেছে। আমরা এর কিছু করতে পারব না। তবে সকলদীপি (কবিরাজ) কিংবা ওঝা হলে হয়তো কিছু করতে পারে। তখন এক সকলদীপিকে ডাকা হল।

সকলদীপি কাকে বলে?

এই এ দেশে যেমন কবিরাজ।

সকলদীপি দেখে বলল—হ্যাঁ বিষ তো লেগেছে কিন্তু এ ভালো করতে পারে ডাক্তার। ডাক্তারদের কাছে নাকি অনেক ভালো ভালো নতুন নতুন দাওয়া আছে তাতে এ সব বিষ-টিষ ছেড়ে যেতে পারে।

কিন্তু ডাক্তার মানে — গাঁ থেকে দশ-বারো ক্রোশ দূরে ওদের হাসপাতাল।

সেদিন আবার দিন ভালো ছিল না। রওনা হতে হতে তার পরদিন হয়ে

গেল। যেতে হয় আবার গোরুর গাড়িতে। এক ক্রোশ যেতে একঘণ্টা লাগে।

আগে কেন যায়নি সকলদীপির কাছে ?

দেখুন ডাকডরই হোক আর সকলদীপিই হোক—গাঁয়ের গৃহস্থ লোক বড় ভয় করে। ওদের দেশে বলে—

'রোগীকা মাতারিকা আঁখকা
লোরসে আটা সানে।
ওহি আটাসে পুরি বনে।
ওহি পুরি খায়।
তবহিঁ সকলদীপি কহায়।'

অর্থাৎ—রোগীর মায়ের চোখের জল দিয়ে আটা মেখে সেই আটা দিয়ে পুরি বানিয়ে—সেই পুরি খায়। আর তা হলেই সে হল আসল সকলদীপি।

এমন যারা লোক—তাদের কাছে সাধারণ লোক যাবে কোন্ ভরসায় ? কত টাকা যে খিঁচে নেবে আর তো ঠিক নেই। তাইতে গিয়েছিল পরামাণিকের কাছে।

ভেবেছিল এ তো সামান্য কাঁটার ব্যাপার। ওদের দেশে পরামাণিকরা কত বড় বড় অপারেশন করে।

কেউ মরে না ?

মরে বই কি।

ও তো হাসপাতালে দেখে এসেছে সেখানে ডাকডররা অপারেশন করে তাতেও মরে।

যাই হোক হাসপাতালে ~~গিয়ে যখন~~ পৌছল তখন ওর হুঁশ নেই। হুঁশ যখন হল তখন পা-টা কেটে ফেলে দিয়েছে।

ছিল দুখানা পা—হয়ে গেছে দেড়খানা। না ঠিক দেড়খানা নয় তার চাইতেও কম।

গ্রামে তুলো আর বাঁশ আর ন্যাকড়া দিয়ে একটা নকল পা মত করে দিয়েছে। সেইটি পায়ে লাগিয়ে আর লাঠি ভর করে চলা যায়—কিন্তু কাজকর্ম করতে ভারী অসুবিধা হয়।

তাইতে এসেছিল সতু বদ্যির কাছে যদি কোন বন্দোবস্ত সতু বদ্যি করতে পারে। যে অসুখ থেকে ওর বাবা মরেছিল সেই অসুখ থেকে ওকে

বাঁচিয়েছে সতু বদ্যি। আর এই দেশোয়ালী গরীব বেচারার পায়ের কোন বন্দোবস্ত কি সতু বদ্যি করতে পারবে না ?

সতু বদ্যি তো দেওতা। আর তা ছাড়া সতু বদ্যির যে বিজ্ঞান বাবা আছে সেই বিজ্ঞান বাবা কিছু করতে পারে না ?

না সতু বদ্যির বিজ্ঞান বাবা তেমন কিছু করতে পারেনি। তেমন কিছু মানে ধরুন এক ফোঁটা ওষুধ কি একটা ইন্‌জেক্‌শন দেয়া হল অমনি একটা ঠ্যাং গজিয়ে উঠলো।

তবে হ্যাঁ। চামড়া, কাঠ, স্প্রিং এই সব দিয়ে একটা ভালো নকল পা তৈরি করে দিয়েছে। তাতে অনেক কাজই আসল পায়ের মত চলে তবে সব কাজ চলে না।

পা-টা আনতে যাবার সময়—সতু বদ্যি বুদ্ধি করে একটা চুস্ত্‌ পায়জামাও নিয়ে এসেছিল।

লোকটির নকল পা বেশ ভালোই ফিট করলো। তার উপরে লোকটি পরলো চুস্ত্‌ পায়জামা। পায়ে জুতো দিল আর হাঁটু অবধি লম্বা পাঞ্জাবী গায়ে দিল। তারপর লম্বা আয়নাটার সামনে লাঠিটা হাতে নিয়ে হেঁটে দেখলো।

রুগী আর তার বন্ধু দুজনেই ভারী খুশি। তারা আবার উচ্চকণ্ঠে ঐকতানে ঘোষণা করলো সতু বদ্যি আদমি নয় দেওতা। বাইরের ঘরে এসে একঘর লোকের ভিতরে আবার গড় হয়ে প্রণাম করলো সতু বদ্যিকে।

সতু বদ্যি বাধা দেবার আগেই প্রণাম তারা সেরে ফেলেছে।

সতু বদ্যি আবার একঘর লোকের সামনে বক্তৃতা শুরু করতে যায়। কিন্তু পারে না।

সতু বদ্যি বলতে যায় বিজ্ঞানের জয়যাত্রার কথা—কিন্তু প্রশ্নবোধক চিহ্নটা এসে বাধা দেয়।

লোকটার আধখানা আসল পা আধখানা নকল পা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রশ্ন-বোধক চিহ্ন। ঠিক যেন প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

সতু বদ্যি বলতে যায় পচন-সৃষ্টিকারী বীজাণুদের পরাজয়ের কাহিনী।

কিন্তু প্রশ্ন এসে বাধা দেয়।

সতু বদ্যি ঘোষণা করতে যায় লুই পাস্তর আর লর্ড লিস্টারের বিজয় গৌরবের কাহিনী।

কিন্তু এবারও প্রশ্ন এসে বাধা দেয়।

বাঁদর নাচ

'আমার দ্বারা আর আপনার ওই শকুশ তাড়ানো হবে না, তাতে আমার চাকরি থাক আর নাই থাক।' সাঙ্কোপাঞ্জা প্রায় সাফ জবাব দিয়ে দেয়।
'কেন কি হল?' ডাক্তারী পত্রিকা থেকে চোখ ভালো করে না তুলেই সতু বগ্নি প্রশ্ন করে।
'আমি তো বলছি তাতে যদি চাকরি যায় তো যাক। রইল আমার চাকরি—। কিন্তু আপনার ওই শকুশ তাড়াতে আমি পারব না, পারব না, পারব না।' পকেট থেকে বড় একটা চকোলেটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাঙ্কোপাঞ্জা বেপরোয়া ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
এইবার সতু বগ্নিকে ডাক্তারী পত্রিকা থেকে চোখ তুলতে হয়।
চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে একটু সাধারণ জ্ঞান, কাজে একটু উৎসাহ আর জীবাণুতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের নিয়মকানুন সম্বন্ধে একটু তত্ত্বজ্ঞান এই যদি সাঙ্কোপাঞ্জার থাকে তাহলে তো সতু বগ্নির কাজ আট আনা কমে গেল।
আর সাঙ্কোপাঞ্জার এসব আছেও।
সেই সাঙ্কোপাঞ্জা যদি হরতাল করে তাহলে তো সতু বগ্নি কাত।
এই ধরুন না। হয়তো কারো নিউমোনিয়া হয়েছে। তাকে রোজ তার বাড়ি গিয়ে ইন্‌জেকশন দিতে হবে আর সেই সঙ্গে যদি রোগীর কুশল সংবাদ ও সংগ্রহ করতে পারে আর রোগীকে ছোটখাট সাহায্য করতে পারে তাহলে তো কথাই নেই। তাছাড়া কুশল সংবাদের ভিতরে নাড়ির গতি নিশ্বাসের গতি এগুলোও শুনতে পারা দরকার।
এ-সব ব্যাপারেই সাঙ্কোপাঞ্জা ওস্তাদ।
ধরুন পাড়ায় কলেরা হয়েছে। কলেরাও গরীব বস্তি অঞ্চলেই বেশী হয়। সাঙ্কোপাঞ্জারা যদি একটু শিক্ষিত আর দরদী হয় তাহলে কত সুবিধা। তিনটি কলেরা রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব যদি সতু বগ্নি নেয় তাহলে এক জায়গায় নিজে বসে থাকতে পারে আর আর দু-জায়গায় স্যালাইন চাপিয়ে দিয়ে সাঙ্কোপাঞ্জাদের বসিয়ে দিতে পারে।

বস্তিগুলোতে কলেরায় প্রতিষেধক ইন্‌জেকশন দেয়া সেও কি কম হাঙ্গাম। রোজ ৩।৪ শো ইন্‌জেকশনই কি শুধু দেয়া? ইন্‌জেকশনের আগে পরে বক্তৃতা নেই? ঝগড়া নেই? আর এ-সব সতু বক্সি নিজে করতে গেলে তো দু-দিনেই ব্যবসা লাটে উঠবে।

অথচ এসব কাজ সাঙ্কোপাঞ্জারাই করতে পারে। যদি তারা একটু শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

সাঙ্কোপাঞ্জারা করেও। সতু বক্সি তাদের শিক্ষিতও করে তুলেছে।

এখন সেই সাঙ্কোপাঞ্জারা যদি হরতাল করে তাহলে সতু বক্সি দাঁড়ায় কোথায়? অথচ সাঙ্কোপাঞ্জাদের শেখাতে সতু বক্সির কম পরিশ্রম হয়নি।

সতু বক্সির কত কাজ। প্রথমতঃ, রোগী দেখা, দ্বিতীয়তঃ, রোগী দেখা আর তৃতীয়তঃও রোগী দেখা।

অথচ এত সব কাজ ফেলেও দিনের পর দিন বক্তৃতা করেছে সতু বক্সি।

আসল কথা হল ব্যাকটিরিয়া অর্থাৎ কিনা জীবাণু। জীবের ভিতরে যারা অণুপ্রমাণ তাদেরই বলা হয় জীবাণু ও এরাই সব শরীরের ভিতরে ঢুকে নানারকম অসুখের সৃষ্টি করে আর তাইতেই মানুষ অসুস্থ হয়।

সতু বক্সি সাঙ্কোপাঞ্জাকে বোঝাচ্ছে, শকৃশ জানো? শকৃশ?

সাঙ্কোপাঞ্জা জানে। শকৃশ একরকম অপদেবতা। রাতবিরেতে অসাবধানে জলে জঙ্গলে চলা ফেরা করলে অনেক সময় শকৃশের পাল্লায় পড়তে হয়। আর শকৃশের পাল্লায় পড়লে ভারী বিপদ। অনেক লোক তো মারাই যায়।

অথচ এই শকৃশ যে কোথায় আছে তা চোখে দেখা যায় না কারণ তারা তো অশরীরী। কিন্তু শকৃশ কোথায় থাকতে পারে আর কি ভাবে আসতে পারে তা জানা থাকলে শকৃশকে এড়িয়ে চলা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়।

সতু বক্সির বক্তৃতা চলতেই থাকে:

আর তাছাড়া তোমরা তো গাঁয়ের ছেলে, তোমরা জানো শকৃশের হাতে মারা যাওয়ার কোন অর্থই হয় না। বিশেষ করে শকৃশের চরিত্র যারা জানে তারা একথা নিশ্চয়ই বলবে।

জানো তো শকৃশের চরিত্রে তিনটি বিশেষত্ব আছে।

প্রথমতঃ, যেখানকার শকৃশ সে তার এলাকার বাইরে কখনই যাবে না। ধরো যে শকৃশ জলে থাকে সে কখনই ডাঙায় উঠবে না। আবার যে ডাঙায় থাকে সে কখনই জলে যাবে না। তেমনি রাস্তার শকৃশ কখনো ঘরে যাবে না।

সুতরাং তোমাকে যদি শকৃশ রাস্তায় তাড়া করে আর তুমি যদি রাস্তা দিয়েই দৌড়তে থাকো তাহলে শকৃশের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া খুবই শক্ত। কিন্তু তুমি যদি রাস্তা ছেড়ে পাশে যে কোন বাড়িতে উঠে যেত পার তাহলে শকৃশ তোমাকে কিছুতেই ধরতে পারবে না।

জীবাণুদেরও তেমনি সব চালচলনের নিয়ম আছে। সেগুলো যদি তুমি মেনে চল তাহলে আর তোমাকে তারা ধরতে পারবে না।

যেমন ধরো এক বাড়িতে কলেরা হয়েছে কিংবা টাইফয়েড হয়েছে। সে বাড়িতে তুমি গেলে—তোমার হাত কাটা থাক, পা কাটা থাক, তাতে কিছু হবে না। কিন্তু কলেরা হতে পারে সে বাড়িতে কিছু খেলে—জলই হোক আর খাবারই হোক। আবার তুমি যদি কলেরার ইন্‌জেকশন আগে থাকতেই নিয়ে রাখ তাহলে তোমাকে আর কিছুতেই কলেরা ধরতে পারবে না।

কিন্তু ধরো তুমি একটা পচা ঘা ড্রেস করতে গেলে। আর তোমার হাতে কাটা ঘা রয়েছে। তাহলে তোমারও হাতে পচা ঘা হতে পারে এমন কি তোমার রক্ত পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। কারণ ঘা পচার জীবাণু কাটা চামড়ার ভিতর দিয়েই ঢুকতে পারে। অথচ সেই জীবাণুও যদি তুমি খানিকটা খেয়ে ফেল তাহলে হয়তো কিছুই হবে না।

আসল কথা তোমার শত্রুকে ভালো করে চিনতে হবে, সে জীবাণুই হোক আর শকৃশই হোক।

যদি ভালো করে চিনতে পার তাহলে শুধু যে অনর্থক ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারবে তাই নয় শত্রুদের হাত থেকেও বাঁচবার রাস্তাও বুঝতে পারবে। তারপর ধরো শকৃশের দ্বিতীয় নিয়ম সত্যিই যদি তুমি ভয় না পেয়ে শকৃশের—সঙ্গে লড়ে যাও তাহলে শকৃশের গায়ের জোর কখনই তোমার চাইতে বেশীও হবে না কমও হবে না। অর্থাৎ কিনা লড়াইয়ে সব সময়ই ড্র হবে। সে রোগা পটকা লোকই হোক আর গামা পালোয়ানই হোক। আর শকৃশ তাল গাছের সমানই হোক আর ইঁদুরের সমানই হোক। অথচ দেখ শকৃশের ভয়েই কত লোক মারা যায়।

তেমনি সব জীবাণুরই ক্ষমতার সীমা আছে। যেমন ধরো কলেরা, টাইফয়েড। জল যদি তুমি ফুটিয়ে নাও তাহলে কিছুতেই তাতে কলেরা টাইফয়েডের জীবাণু থাকতে পারবে না—সে টল্‌টলে পরিষ্কার জলই হোক আর নোংরা ঘোলা জলই হোক। আবার যদি কোন জলে এই সব জীবাণু ঢোকে

তাহলে সেই জীবাণুদের যতক্ষণ না মারছো ততক্ষণ জল তুমি যতই পরিষ্কার করো কোন লাভ হবে না।

সতু বস্তির বক্তৃতা চলতেই থাকে :

আবার ধরো শকুণের কথা। তুমি গাঁয়ের ছেলে, তোমাকে আমার বলবার কোন দরকার নেই। কিন্তু সব শকুণই শত্রু নয়। ধরো রাত দুপুরে তোমার দিকে একটা শকুণ এগিয়ে এল। প্রথমে তোমার বুঝতে হবে ওটা মদ্দা শকুণ না মাদী শকুণ। মদ্দা শকুণ হলে ব্যাটাছেলের সঙ্গে ঝগড়া করবেই অথচ মাদী শকুণ হলে কখনই ব্যাটা ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করবে না। আবার মেয়েছেলের বেলায় ঠিক তার উল্টো।

কিন্তু প্রশ্ন হল—অন্ধকার রাতে চিনবে কি করে—শকুন মদ্দা না মাদী ?

তাও তো জানো মদ্দা শকুণ সব সময়ই আসবে পুরুষ মানুষের ডানদিক দিয়ে আর মাদী শকুণ আসবে বাঁদিক দিয়ে।

তেমনি জীবাণু—সব জীবাণুই আমাদের শত্রু নয়। কোন্ জীবাণু আমাদের বন্ধু আবার কোন্ জীবাণু আমাদের শত্রু—সেও চিনতে হবে।

এইভাবে দিনের পর দিন সতু বস্তি সাঙ্গোপাঙ্গদের শিক্ষিত করে তুলেছে। এখন তারাও জীবাণুতত্ত্ব আর রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে খানিকটা বোঝে আর দরকার হলে অশিক্ষিত দরিদ্র লোকদের বোঝাতেও পারে।

সেই সাঙ্গোপাঙ্গ এখন বিদ্রোহ করছে। এতদিন যারা রোগ শোকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ছিল সতু বস্তির সেনাপতি আজ তারা যদি বিদ্রোহ করে তাহলে সতু বস্তি দাঁড়ায় কোথায় ?

যে রোগই হোক তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ ছাড়া সতু বস্তির চলবে কি করে ?

যেমন ধরুন যক্ষ্মারোগ।

সাঙ্গোপাঙ্গ সতু বস্তির কাছে যক্ষ্মাবীজাণুদের কায়দা করার নিয়মকানুন শিখে নিয়েছে। যেমন—

রোগীর চিকিৎসা : ভালো খেতে দেবে। সারাদিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে দেবে। আর ওষুধ দেবে ডাক্তারের নির্দেশমত।

অন্য লোককে বাঁচানো : তাদের রোগীর ঘরে আসতে দেবে না। রোগীর বাসনপত্র ব্যবহার করতে দেবে না। আর রোগীর থুথু কফ যাতে রোজ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় সেদিকে নজর রাখবে।

সাঙ্কোপাঙ্গারাও চেষ্টা করে রোগীদের ভিতরে এই সব নিয়মকানুন যথাসাধ্য চালাতে। তাদের সুবিধাও আছে। একদিন বাদে একদিন তার যক্ষ্মা রোগীদের স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইন্‌জেকশন দিতে যেতেই হয়। তখন তাদের সব বিষয়েই তদ্‌বির তদারক করে আসতে পারে।

সাঙ্কোপাঙ্গারা অবিশ্যি আপত্তি এর আগেও করেছে।

ধরুন খাওয়া সম্বন্ধে। সতু বস্তির এলাকায় একটা লোহা কারখানা আছে। সেখানকার মজুর মাসে মাইনে পায় ৬০।৬৫ টাকা! তার যেই যক্ষ্মারোগ হল সে ছুটি যদিও পেল কিন্তু তার রোজগার হল বন্ধ। তাহলে সতু বস্তির নিয়মমত সে খাবে কি করে?

তাছাড়া বস্তিতে হয়তো এক ঘরে থাকে দশজন। তার ভিতরে যদি একজনের যক্ষ্মারোগ হয় তাকে আলাদা করবে কি করে?

সুতরাং সাঙ্কোপাঙ্গার আপত্তি করা এমন কিছু অন্যায় নয়।

কিন্তু সতু বস্তি বলে—তার রোগীর পাওনা আদায় করার চেষ্টা করতেই হবে। ষোল আনা পাওয়া না গেলে পনেরো আনা, পনেরো আনা না হলে চোদ্দ আনা, তের আনা—যতক্ষণ এক পয়সা পাওয়ার আশা থাকবে ততক্ষণ তারই চেষ্টা করতে হবে।

এই কাবলীওয়ালা পদ্ধতিতে যে সাঙ্কোপাঙ্গা আপত্তি করেনি তা নয়। লোকের অবস্থার দিকে না তাকিয়ে তাদের উপদেশ দেবে কি বুদ্ধিতে।

কিন্তু যত দিন গিয়েছে তত ও দেখেছে দিনের পর দিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জোর করে নিয়ম মানিয়ে কত রোগী সেরে গিয়েছে। কর্মক্ষম হয়ে বেঁচে আছে। তাছাড়া দেখেছে দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি এদের নেই। কিছুতেই নেই। অথচ একটা রোগমুক্তি যদি জোর করেও হয় তাহলে সেটাও একটা বিরাট লাভ।

তাইতে সাঙ্কোপাঙ্গা এখন মন থেকেই মেনে চলে সতু বস্তির আদেশ আর উপদেশ।

'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়তে না পারলেও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়তে পারবে। বুঝলে সাঙ্কোপাঙ্গা, তাই আমাদের লাভ।'

সুতরাং সাঙ্কোপাঙ্গা লড়াই চালিয়ে গিয়েছে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে।

তবে এ রকম প্যাঁচে যে সাঙ্কোপাঙ্গা পড়বে তা কখনই ভাবেনি। আর তাইতেই আজ সাঙ্কোপাঙ্গা সোজাসুজি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

গরীবের ছেলে। চাকরি করে খেতেই হবে। সুতরাং সতু বক্সি যা বলবে তা করতেই হবে। সাঙ্কোপাঞ্জা তা করবেও। কিন্তু এই দৈনন্দিন লড়াই চালিয়ে যাওয়া—রোজ বক্তৃতা করা, রোজ তদ্বির করা সে আর সাঙ্কোপাঞ্জা করবে না।

এই অদৃশ্য শত্রুর তাড়া করে বেড়ানো আর মরীচিকার পিছনে ঘুরে বেড়ানোতে কোন তফাৎ নেই।

সামান্য চাকরির জন্যে মানুষ খুনের দায়িত্ব আর সাঙ্কোপাঞ্জা নেবে না, নেবে না, নেবে না।

আর হ্যাঁ, সতু বক্সিই বা কেন নেবে?

সাঙ্কোপাঞ্জার রাগের অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। ঘটনাটা শুনলে বুঝতে পারবেন।

যক্ষ্মারোগ হয়েছে একটি বউয়ের। তার স্বামী কাজ করে সতু বক্সির এলাকার এক লোহা কারখানায়। মাসিক মাইনে পায় প্রায় ১০০ টাকা। তাদের আবার দুটি ছেলেমেয়ে। বড় রুমকি আট বছরের ছেলে আর ছোট ঝুমকি ছ-বছরের মেয়ে। স্বামীটি এসে সতু বক্সির দ্বারস্থ হলেন আর সতু বক্সিও যথারীতি চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

প্রথমে সাঙ্কোপাঞ্জা গিয়ে দেখে এল তাদের থাকবার ঘরবাড়ি। শহর ছাড়িয়ে এক বস্তিতে ওরা থাকে। একখানা ঘর—মাটির দেয়াল, খোলার চাল। আর একফালি বারান্দা। সাধারণ বস্তিবাড়ির চাইতে বারান্দাটা বরং একটু বড়ই। বারান্দার ব্যবহার অনেক রকম। কখনো রান্নাঘর, কখনো খাবার ঘর আবার কখনো বা বসবার ঘর। রোগীকে রাখবার বন্দোবস্ত হল ঘরের ভিতরে। আর রুমকি ঝুমকি আর তাদের বাবা—এদের থাকবার বন্দোবস্ত হল বারান্দায়। রোগিনীর স্বামী অবসর সময় রান্নাবাড়া নিজেই করবেন। অসুবিধা কেবল ন-ঘণ্টা। ডিউটির সময় আর যাতায়াতের সময়। সব মিলে ঘণ্টা নয়েক। তবে বস্তিরই আর এক ঘরের বউ সে দায়িত্ব নিল ওই সময়টুকু ছেলেমেয়ের দেখাশোনার। সে আবার রুমকি ঝুমকির মাসীমা কিনা—বস্তিতুত মাসীমা।

রোগিনীর বাসনপত্র, কাপড়চোপড় আলাদা করে দেয়া হল। সাঙ্কোপাঞ্জা একদিন পর একদিন স্ট্রেপ্টোমাইসিন দিতে শুরু করল। আর সেই সময় তার নিয়মমত কড়া তদ্বির তদারকও চালিয়ে গেল।

রুমকি ঝুমকির টিউবারকুলিন আর অন্যান্য পরীক্ষা করিয়ে সতু বস্তিও ইতিমধ্যে দেখেছে রোগের সংক্রমণ এখনও তাদের হয়নি।
নিয়মমাফিক কাজ চলছিল বলে সতু বস্তি, সাঙ্কোপাঞ্জা, রোগিনী সবারই মেজাজ বেশ ভালোই ছিল এতদিন।
রোগী ভয়ে ঘরের বাইরে বের হয় না। সাঙ্কোপাঞ্জা ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে বলেছে সেই ভয়ে নয়, বাইরে বের হলে নাকি রুমকি ঝুমকিরও ছোঁয়াচ লেগে এই অসুখ হতে পারে। সেটা একটা বড় ভয় সন্দেহ নেই।
বেশ চলছিল। সাঙ্কোপাঞ্জা মোটামুটি নিশ্চিতই হয়েছিল—রোগী তার সেরে উঠবে।
এই তো মাস দু-তিন ইনজেক্‌শন আর শুয়ে থাকা আর তারপর আরও কিছুদিন ওষুধ খাওয়া। তারপর বছর দু-তিন পেটে হাওয়া দেয়া।
কত রোগী সেরে ওঠে, এ আর কি।
কিন্তু তারপরেই এই দুর্ঘটনা।
সেদিন হয়েছে কি, আটটার সময় রোগিনীর স্বামী রান্নাবাড়া করে রেখে কারখানায় চলে গিয়েছেন। বস্তিভূত মাসীমা বসে আছেন রুমকি ঝুমকিকে নিয়ে। একটা কাঁসার হাতা আর বাটি রেখে গিয়েছেন রোগীর সামনে। দরকার হলে হাতা দিয়ে কাঁসার বাটিতে ঠুকলেই পাশের ঘর থেকে শোনা যাবে।
এ সব কায়দা—সাঙ্কোপাঞ্জার নিজের আবিষ্কার।
বেলা বারোটা নাগাদ পড়শী বউটি তার নিজের বাচ্চা আর রুমকি ঝুমকি-কে নিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে একটু চোখ বুজেছে—ঘুমিয়ে পড়েছে একটু।
এমন সময় পাশের ঘর থেকে আওয়াজ টুন্‌টুন্‌। কোন সাড়া নেই। আবার আওয়াজ টুন্‌টুন্‌। সবাই ঘুমুচ্ছে। আবার টুন্‌টুন্‌ টুন্‌টুন্‌। রুমকি উঠে ডাক দেয় ছোট বোনকে, 'ঝুমকি! ঝুমকি, ওঠ্‌ মা ডাকছে।' দুজনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে বাইরে। মাসীমা কিন্তু ঘুমুচ্ছে তখনও অঘোরে।
বাইরে এসে রুমকি ঝুমকি জানলা দিয়ে মাকে ইশারা করে 'মা ডাকছ?' হ্যাঁ, মা ডাকছেন। খাবার জল ফুরিয়ে গিয়েছে কি না, একটু খাবার জল চাই মায়ের। মাসীমা কি ঘুমুচ্ছে?
ঘুমোক না তাতে কি? ওরা দুজনে জানলা দিয়ে মাকে এক গ্লাস জল এগিয়ে দেবে। না, ওরা ঘরে যাবে না, মা যখন মানা করেছে।
মা রাজী হয়ে যান।

রুমকি ঝুমকি মহা খুশি।

বারান্দার এক কোণে জানলা। জানলাটা একটু উঁচু। রুমকি একটা জলচৌকী রাখে জানলাটার পাশে। তার উপরে রাখে একটা ছোট্ট টুল। কেরাসিন কাঠের ছোট নড়চড়ে টুল। তার উপরে আস্তে আস্তে ঝুমকি ওঠে। গ্লাসে জল ভর্তি করে রুমকি তুলে দেয় ঝুমকির হাতে। ভিতর থেকে মা হাত বাড়ান। জলের গেলাসটা নিয়ে নেন।

তারপর কি রকম বোকার মত খেয়াল হয় ঝুমকিটার। মা মা বলে দু-হাত গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে মায়ের। মাও এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে সাঙ্কোপাঞ্জার কথা, 'যতদিন না আপনি সম্পূর্ণ সেরে যাচ্ছেন ততদিন আপনার ছেলে-মেয়েকে চুমু খাওয়া আর একটা কেউটে সাপ চুমু খাওয়া একই কথা—মনে থাকে যেন।'

মা সরে যান।

ঝুমকি পারে না মাকে ধরতে। দুটো পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে দুটো হাত বাড়িয়ে আঁকু পাঁকু করে।

হঠাৎ কিরকম করে হড়কে যায় পায়ের তলার টুলটা। মা ধরবার আগেই ঝুমকি পড়ে যায় চিৎপাত হয়ে।

নীচে ছিল নিবু নিবু উনুন। রুমকি ঝুমকির বাবা—উনুনের উপর গুঁড়ো কয়লা ছড়িয়ে কারখানায় যান। ফিরে এসে আর উনুন ধরাবার প্রয়োজন হয় না। তার উপর এসে পড়ে ঝুমকি।

রুমকি একটু দূরে গিয়েছিল। দূরে মানে বস্তির দোরগোড়ায় বাঁদর নাচিয়েরা এসেছিল।

ঝুমকি আর মায়ের আর্ত চিৎকারে রুমকি ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণে আগুন লেগে গেছে ঝুমকির ইজেরে আর জামায়, চুলে আর চামড়ায়।

আর্তনাদ করছে, ছটফট করছে ঝুমকি, চিৎকারে রুমকি যোগদান করে—ছুটে এগিয়ে যায় ঝুমকিকে বাঁচাতে।

বস্তিতুত মাসীমা দৌড়ে আসেন চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে। মা বেরিয়ে আসেন দরজার কড়া আর সাঙ্কোপাঞ্জার নির্দেশ ভেঙে।

কিন্তু ততক্ষণে দুজনেই পুড়ে গিয়েছে।

রুমকির পুড়েছে হাত আর পা।

সাঙ্কোপাঞ্জা ইনজেকশন দিতে গিয়েছিল আবার ঠিক সেই সময়েই।

তখন দেখে এসেছে সেই বীভৎস দৃশ্য।
আর শুধু আধপোড়া রুমকি ঝুমকি ?
আজ হাসপাতালে গিয়ে মরা ঝুমকিকেও দেখে এসেছে সাঙ্কোপাঙ্গা।
আধপোড়া, কালো, চুলপোড়া মড়া—টার্কি রোস্টের মত বীভৎস ঝুমকি।
সুতরাং ?
সাঙ্কোপাঙ্গা আর পারবে না এসব করতে।
ইন্‌জেকশন ? হ্যাঁ, দেবে।
সতু বগ্নির হুকুম ? হ্যাঁ, মানবে।
কিন্তু অদৃশ্য বীজাণুই হোক আর শকুনই হোক আর মরীচিকাই হোক তার পিছনে দৌড়তে আর সাঙ্কোপাঙ্গা পারবে না।
পারবে না, পারবে না, পারবে না।
সতু বগ্নি শোনে। মনোযোগ দিয়ে শোনে সব কথা। সাঙ্কোপাঙ্গার অভিযোগ শোনে। রোগিনীর কান্না শোনে সাঙ্কোপাঙ্গার কান দিয়ে। ঝুমকির মৃত্যু দেখে সাঙ্কোপাঙ্গার চোখ দিয়ে।
সাঙ্কোপাঙ্গার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া তামাটে চকোলেটও দেখে।
সাঙ্কোপাঙ্গা কিনে নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে ঝুমকিকে দেবার জন্যে।
তারপর শুরু করে সতু বগ্নি।
হ্যাঁ, সতু বগ্নি জানে। সব জানে। এই দারিদ্র্য আর অজ্ঞতার অচলায়তন প্রাচীর পর্বতের মতই দৃঢ় আর অনড়।
তবুও কেন যে সতু বগ্নি মাথা ঠুকে মরে ওই প্রাচীরে—তা সতু বগ্নি নিজেও ভালো করে বোঝে না।
খানিকটা ব্যবসা। তবে বেশীর ভাগই অভ্যাস।
সতু বগ্নিদের দেশে একটা লোক ছিল।
সতু বগ্নি গল্প শুরু করে ঃ
সে গাজনে সঙ্‌ সাজতো। সাধারণ অল্পশিক্ষিত গেরস্ত লোক। সারা বছর একটু বিষয় আশয় দেখে, একটু আড্ডা দিয়ে আর একটু হাটবাজার করে তার দিন কাটত। কিন্তু সারা বছর সে তাকিয়ে থাকত ওই গাজনের দিকে। তখন সে রঙ্‌ মাখত, সাজ পরত, লম্বা রঙ্‌-করা খড়ের লেজ লাগাতো। তারপর হনুমান সেজে গাছতলায় যেত লাফাতে।
ত্রিশ বছর ও এই করেছে। ওই গাজনের দিনে হনুমান সেজেছে।

কিন্তু তারপর এক ঘটনা হল। এই ত্রিশ বছরের ভিতরে তার একটি ছেলে হয়েছে। শুধু তাই নয়, ছেড়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তারপর কি এক পরীক্ষা দিয়ে হয়ে গিয়েছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

ফলে গ্রামে তার নাম ডাকও বেড়েছে, মান ইজ্জতও বেড়েছে।

সুতরাং, গাজনে যদি তাঁর বাবা হনুমান সেজে লাফায় তাহলে ডেপুটি সাহেবের মান ইজ্জত কোথায় থাকে ?

তাইতে ফি বছর ডেপুটি লিখে পাঠান তাঁর বাবাকে—এখন আর গাজনে হনুমান সাজা চলবে না।

বাবাও রাজী হন প্রত্যেক বছরেই। কিন্তু যেই চড়ক পূজোর দিন গাজন তলায় ঢোলে কাঠি পড়ে—অমনি ভদ্রলোক যেন কি রকম হয়ে যান, ঠিক লেজ লাগিয়ে হনুমান সেজে বেরিয়ে যান—ঢোলের তালে তালে নাচতে নাচতে। বছর দুই এরকম হবার পর শেষে একবার গাজনের আগে ডেপুটি সাহেব দেশে চলে এলেন। এইবার বাবা কি করে হনুমান সাজেন তিনি দেখে নেবেন। যাই হোক তাঁর একটা মান ইজ্জত আছে তো!

গাজনের দিন সকালবেলা তিনি বাবাকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দিলেন।

কিছুতেই আর আজ বাবাকে বের হতে দেবেন না।

সারাদিন যাবার পর যখন সন্ধ্যা হয়েছে, গাজনতলায় ঢোল বাজছে খুব জোর—আরো জোর, তখন ডেপুটি সাহেব বাবার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। দেখবেন বাবা কি করছেন।

কি দেখলেন জানো ?

দেখলেন বাবা পরনের কাপড় খুলেছেন, কাপড়টা পাকিয়ে লম্বা লেজ বানিয়ে কোমরে বেঁধেছেন। তারপর জানলার গরাদ ধরে লাফাচ্ছেন ঢোলের তালে তালে।

বাবা এ বছরও হনুমান সাজলেন।

সতু বত্থি গল্প শেষ করে।

সাঙ্গোপাঙ্গা তাকিয়ে থাকে সতু বত্থির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে। বুঝতে পারে না, হাসবে না রাগ করবে।

মাতৃ দর্শন

রিপোর্ট দেখে সতু বক্সি বেকায়দা। ম্যানটু পরীক্ষা পজিটিভ ১'.১০০০,০০০তে; ১'.১,০০,০৯০তে আবার ১.'১০,০০০তেও। আড়াই বছরের ছেলের যদি ওই রিপোর্ট আর ওই এক্সরে হয় তাহলে টি-বির আক্রমণ যে ওর দেহে হয়েছে শুধু তাইই নয়, কর্মরত যক্ষ্মাবীজাণুও ওর দেহে রীতিমত গজ গজ করছে।

কিন্তু তাতে ঘাবড়ানোর ছেলে সতু বক্সি নয়। সতু বক্সি জাত বক্সি। সেই যে মুর্শিদাবাদের নবাব বাড়ি? সেই বাড়িতে বেগম সাহেবার ব্যামো। কেউ সারাতে পারে না—শেষ পর্যন্ত কবিরাজ মশাইয়ের ডাক পড়ল। কিন্তু আমীর ওমরাহরা কাফেরকে দিয়ে রুগী পরীক্ষা করানো তো দূরের কথা রুগীর নাড়ী পর্যন্ত পরীক্ষা করতে দেবে না। রোগীর কব্জীতে সুতো বেঁধে সেই সুতোটা কবিরাজ মশাইকে পরীক্ষা করতে দেওয়া হল। কবিরাজ মশাই সুতো ধরে বললেন, 'এত চতুষ্পদীয় নাড়ী।' পর্দা তুলে দেখা গেল হুম্বার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে। কবিরাজ মশাইকে পরীক্ষা করবার ফিকির। সেই কবিরাজ মশাইএর বংশধর সতু বক্সি। না হয় এম-বি পাশ করে ডাক্তারীই করে কিন্তু ঐ বংশের ছেলে রুগী দেখে ঘাবড়ায় না।

আর তাছাড়া বাচ্চাদের যক্ষ্মারোগ! একটু ভালো খাওয়া দাওয়া, একটু বিশ্রাম, বড় জোর একটু স্ট্রেপ্টোমাইসিন—প্যাস, একদম সেরে যাবে।

কিন্তু ঘাবড়ানোর কারণ অন্য।

সে প্রায় বছর চারেক আগেকার কথা। সতু বক্সি বিকেল বেলা বসে ডাক্তারী করছে। একটি মেয়ে ঢুকল চিঠি নিয়ে। একজন রুগী পরিচয় পত্র দিচ্ছেন: এই মেয়েটির বড় অসুখ। ডাক্তারকে দেখতে হবে।

সতু বক্সি জিজ্ঞেস করে, 'কী অসুখ?'

মেয়েটির প্রায় মাস ছয়েক ধরে বুক ধড়ফড় করে। মাথা ঘোরে যখন তখন, আর আগে মাঝে মাঝে ফিট হয়ে যেত। সপ্তাহে হয়তো একবার দু-বার ফিট হত, কিন্তু এখন দিনে দু-বার তিনবার ফিট হয়। হ্যাঁ,

তবে এতবার ও ফিট হয়ে গিয়েছে একবারও তেমন কোন চোট লাগেনি। আর কপাল ভালো, ধারে কাছে কেউ নেই এরকম সময়ও কখনো ফিট হয়নি।
ব্যক্তিগত ইতিহাস: প্রায় এক বছর হল বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে পরিচয় ছিল, সেই পরিচয়ই পরিণয়ে পরিণত হয়। কিন্তু বিয়ের পাঁচ মাস পরেই স্বামী বিদেশে চলে গিয়েছেন চাকরিতে। এই পাঁচ মাসে কোন সন্তানের সম্ভাবনা হয়নি। আর্থিক অসুবিধার জন্যে জন্মনিরোধের বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। এখন নিজে স্কুলে টিচার—মাইনে পঞ্চাশ টাকা।
পারিবারিক ইতিহাস: বিশেষ কোন প্রাসঙ্গিক সংবাদ নেই।
পূর্ব ইতিহাস: অত্যন্ত হাসিখুশি আর আনন্দপ্রবণ মেয়ে ছিল। মনের জোরও ছিল বেশ। আর যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম করতে পারত। বিয়ের আগে ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে বসে গল্প করার মত কোন স্থান না থাকাতে তাদের রাস্তায় হাঁটতে হত একসঙ্গে। কতদিন হাঁটতে হাঁটতে শহরের বাইরে চলে গেছে। কতদিন ছ-মাইল সাত মাইলও হেঁটেছে। অথচ তখন কোন কষ্ট হয়নি। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার ইচ্ছে ওদের ছিল না। ইচ্ছে ছিল ও নিজে একটা কিছু ভালো মাইনের চাকরি পাবে, স্বামীও একটা ভালো কাজ পাবেন তারপর দুজনে বিয়ে করে সংসার পাতবে। কিন্তু দুজনে আলাদা থাকতে বড় কষ্ট হত। তাছাড়া সবার সামনে লুকোচুরিও ভালো লাগত না। সবচাইতে আপনার লোককে পর হিসাবে পরিচয় দেওয়া মোটেই ভালো লাগে না। তাইতেই বিয়ে করতে হল তাড়াতাড়ি। কিন্তু নিজের ৫০ টাকা আর স্বামীর ৮০ টাকা এতে তো বাসা ভাড়া করে সংসার চালানো মুশকিল। সেই জন্যেই স্বামীকে যেতে হল বিদেশে চাকরি করতে, তাইতে বড় ফাঁকা লাগে।
পরীক্ষা করে দেখা গেল মেয়েটি কেমন ছটফট করে। কথা বলার সময় বারবার মাথায় হাত দেয়, গা চুলকোয়। কি রকম যেন চোখের চাউনিটা। সতু বদ্যি বোঝে তৃষ্ণার্ত চোখ।
তাছাড়া সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করেও কিছু পাওয়া যায় না।
রোগ নির্ণয়: হিস্টিরিয়া অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে রোগিনী নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না। পাঠ্য বইয়ে লেখে এটা শারীরিক অসুখ নয় মানসিক অসুখ। সতু বদ্যি জাত বদ্যি হলেও আধুনিক বিজ্ঞানের খবর রাখে। দেহকেও তার পারিপার্শ্বিক থেকে আলাদা করে দেখে না। দেহ

আর মন আলাদা করে ভাগও করে না। সুতরাং চিকিৎসা কি হওয়া উচিৎ এ বিষয়ে জাত বন্থির ভুল হয় না। হয় পরিপার্শ্বিকের চরিত্র পরিবর্তন আর না হয় রোগিনীর চরিত্র পরিবর্তন।

পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন?

সামান্য একটা চাকরি ওর স্বামীকে যোগাড় করে দেয়া আর একটা ছোট বাসা। দুজনে এক সঙ্গে থাকবে। খুব জাঁকজমকে নয় সাদাসিদে ভাবে। ছোট্ট একটা ভালো বাসা। সামান্য একটু ভালবাসা আর একটি খোকা।

মানুষ পরিবর্তন? ওকে এমন মানুষ তৈরি করা—যে নিজের সংসার চাইবে না—নিজের স্বামী সঙ্গ চাইবে না—এমন কি নিজের সন্তানও চাইবে না?

দুটোই অসম্ভব—তাহলে উপায়? উপায় সতু বন্থি একটা বার করে। প্রথমতঃ, যদি একটা শারীরিক ব্যাধি সৃষ্টি করা যায়? খুব বেশী অসুখ। খুব যন্ত্রণাদায়ক। তাহলে সেটা সেরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ফিটগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে। তবে কিছুদিনের জন্যে। ভালবাসার কাঙাল এই মেয়েগুলোকে ভাল-বাসার জিনিস না দিলে আবার ফিট হবে। তবে যে কয়দিন ভালো থাকবে তার ভিতরে যদি ওর স্বামী এখানে এসে যায়? অন্ততপক্ষে যদি একটা বাচ্চাও ওর স্বামী ওকে উপহার দিতে পারে? তাহলে হয়তো আর ফিট হবে না। হয়তো রোগিনী ভালো হয়ে যাবে।

সুতরাং সেই রকমই ব্যবস্থা হয়েছিল। টি-এ-বি,—শিরার ভিতরে ইন্‌জেকশন দিয়ে জ্বর তৈরি করা হল কয়েকবার। আর স্বামীকে উপদেশ দেয়া হল—হয় একসঙ্গে থাক না হয় তো একটা বাচ্চা হোক।

তারপর দেখা হয়েছে বাচ্চা পেটে। মেয়েদের বাচ্চা হবার আগে, গর্ভা-বস্থায় বিশেষ করে প্রথমবার ভারী মিষ্টি হয় চেহারা। মেয়েটির চেহারা সাধারণ মেয়ের চাইতেও অনেক বেশী মিষ্টি হয়েছিল। লাজনম্র চোখ থেকে যেন মধু ঝরে পড়ত।

তবে সে রূপ বর্ণনা করার ক্ষমতা সতু বন্থির নেই। নেহাৎই জাত বন্থি। রোগী ঘেঁটে খায়। মহাকবি কালিদাসের সাহায্য নিতে হয় তাইতেঃ

> 'শরীর সাদাদ সমগ্রভূষণা মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্র পাণ্ডুনা।
> তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী।'

শরীর শুকিয়ে গেছে। অলংকার পরতে পাচ্ছেন না। মহারানী সুদক্ষিণা

মহারাজ দিলীপের মহারানী। তাঁর অলংকার থাকা সত্ত্বেও পরতে পারতেন না। কিন্তু সতু বদ্যির রোগীর অলংকারের অভাব ছিল। কিন্তু মিলের অভাব হয়নি। মুখ যেন লোধ্রফুলের মত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করল।

ভোরের আকাশে তারা নিভে গেলে—চাঁদের প্রভা কমে গেলে রজনী সুন্দরীর যেমন ম্লানরূপ হয় তেমনি রূপ।

শেষ যামের রজনী প্রসব করবেন সূর্য। প্রকৃতির মহামূল্যবান সম্পদ। সতু বদ্যির রোগিনীও তো কম নন। তিনি প্রসব করবেন মানুষ। গোটা প্রকৃতিকেই যে জয় করবে। বাচ্চা হবার পর কি রকম দেখতে হয় নতুন মা? পটের গণেশ জননীর মত?

না তার চাইতেও মিষ্টি।

রাফায়েলের ছবির মত?

না আরও মিষ্টি।

তাকিয়ে দেখেই সতু বদ্যির পাওনা মিটে যেত।

স্বামীর কিন্তু চাকরির উন্নতি হয়নি—বরং হয়েছে অবনতি। ছেলেটি দুধ পেত না—না মাইয়ের না গাইয়ের। কি রকম যেন রোগা হয়ে যাচ্ছিল।

তাইতে এখন ম্যান্টু পজিটিভ।

সতু বদ্যির চোখের সামনে ভেঙে যায় গণেশ জননীর পট। ছিঁড়ে যায় রাফায়েলের ছবি। কি করবে? কোথায় পাবে ভালো খাওয়া সতু বদ্যির খোকা রোগী? আর বাচ্চাটা যদি মরে যায়? মা-টার তাহলে তো হবে আবার ফিট। আর এবার হয়তো বাচ্চা হলেও সারবে না।

সতু বদ্যি বেকায়দা।

একবার সতু বদ্যি গিয়েছিল নৌকোয় করে বাঙাল দেশে রাত্তির বেলা রোগী দেখতে। সারারাত নৌকো চালিয়ে ভোর বেলায় বাঁক ঘুরে সতু বদ্যির মাঝি দেখে—যেখান থেকে রওনা হয়েছিল সেইখানেই ফিরে এসেছে। মাঝি বলল, 'কানা হোলায় ধরছে।' কাপড়টা ঘুরিয়ে পরতেই কিন্তু কানা হোলা ছেড়ে দিয়েছিল।

চার বছর ঘুরে সতু বদ্যি আজও আবার ফিরে এসেছে একই ঘাটে। কিন্তু এবার কি আর কাপড় ঘুরিয়ে পরলে কানা হোলা ছাড়বে? না গোটা দুনিয়াই ঢেলে সাজাতে হবে?

সতু বদ্যি কি তা পারবে।

পিশাচ

সতু বদ্যি ঠকে গিয়েছে—ভীষণ ঠকে গিয়েছে। কিছু টাকা লোকসান হয়েছে—তাতে হয়তো সতু বদ্যি একটু বিরক্ত হত। কিন্তু এভাবে ঠকে বোকা বনে যাওয়াতে সতু বদ্যি রীতিমত চটে যায়। প্রথমে নিজের উপর রেগে যায় তারপর রেগে যায় যে ঠকিয়েছে তার উপর।

১৯৪৯ সালের এক ঘটনা।

প্রায় দিন পনেরো আগের কথা। পাশের বস্তি থেকে একটি মেয়েলোক এসেছে। কোলে একটি ছোট বাচ্চা মাস কয়েকের কি তারও কম হবে বলে মনে হয়। রোগা কালো অপুষ্ট বাচ্চা। পোশাক বলতে একটা ছেঁড়া ময়লা ফ্রক। নিয়ে এসে শুইয়ে দেয় সতু বদ্যির টেবিলে।

ছেলেটির সর্বাঙ্গে কালো কালো দাগ। 'হাম হয়েছিল বুঝি?' সতু বদ্যি প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, হামই হয়েছিল। কয়েক দিন খুবই জ্বর ছিল। সারাদিন মনে হত গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বেহুঁশের মত পড়ে থাকত বাচ্চাটা। তারপর হাম বের হল। আর সে কী হাম! গায়ে একটা সরষে রাখবার জায়গা ছিল না। হামটা বেরিয়ে যাবার পর জ্বরটা কমে গেল। কিন্তু হাম হবার আগে থাকতেই যে কাশিটা হয়েছিল সেটা আর কমল না। এখন পরশু দিন থেকে আবার ভীষণ জ্বর হয়েছে আর অনবরত হাঁপাচ্ছে। মনে হয় দম নিতেই বোধ হয় কষ্ট হয়। তাছাড়া কাল থেকেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে—কিছু খাচ্ছেও না। হাঁপাচ্ছে। খালি হাঁপাচ্ছে........।

বাচ্চার মা ইতিহাস শেষ করেন।

সতু বদ্যি পরীক্ষা শুরু করে। নাড়ির গতি মিনিটে প্রায় ১৬০ বার অত্যন্ত ক্ষীণ। নিশ্বাসের গতি মিনিটে প্রায় ষাট বার। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নাকের দুটো পাশ উঠছে আর নামছে। বুকটাও চলছে যেন একটা হাপর। স্টেথোস্কোপ লাগানোর পর সতু বদ্যির রোগ নির্ণয়ে আর কোন অসুবিধা হয় না।

ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় ফুস-ফুসের শ্বাসবাহী প্রণালী আর শ্বাসপ্রশ্বাস চালনাকারী তন্তু—দু-এরই প্রদাহ হয়েছে। প্রথমে হাম হয়েছিল তারপর এই ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। হামের পর এই ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া অত্যন্ত বেশী হয়। অবিশ্যি ব্রঙ্কোনিউ-মোনিয়ার জন্যে দায়ী হামের জীবাণু নয়—দায়ী অন্য বীজাণুরা যারা হামের ফলে দুর্বল দেহ আক্রমণ করে। পেনিসিলিনে যদিও হামের জীবাণুকে কাবু করা যায় না—কিন্তু তার পরবর্তী অনাহূত অতিথিদের স্বচ্ছন্দেই বিতাড়িত করা যায়।

যাই হোক হামের পর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াতে শিশু-মৃত্যুর হার খুবই বেশী। সতু বশ্বি ডাক্তারী করা শুরু করেছে সবে কয়েক বছর। ও শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

'পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন দিতে পারবেন? এক একটা ইন্‌জেক্‌শনের দাম চার টাকা।' সতু বশ্বি প্রশ্ন করে শিশুর মাকে।

'কটা ইন্‌জেক্‌শন লাগবে ডাক্তারবাবু?' প্রশ্ন করেন শিশুর মা।

'তাতো বলা যায় না—তবে তিন-চারটে বোধ হয় লাগবে। দৈনিক একটা করে দিতে হবে। তবে আপনার ছেলে যদি তিন-চার দিন বেঁচে থাকে তাহলেই অতগুলো ইন্‌জেক্‌শন লাগবার কথা। যে অবস্থায় এনেছেন কি হবে বলা শক্ত।' সতু বশ্বি ইন্‌জেক্‌শনের সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে করতে বলে।

'অত টাকা তো নিয়ে আসিনি ডাক্তারবাবু? মোটে আট আনা নিয়ে এসেছি। আজ যদি ইন্‌জেক্‌শনটা দিয়ে দেন—তাহলে কাল এসে সব টাকা শোধ করে যাব।' মেয়েলোকটির কথায় করুণ মিনতি। আর তাছাড়া আন্তরিকতা পরিস্ফুট তার সারা মুখেই।

'আচ্ছা বলছেন প্রথম ৪।৫ দিন জ্বরে বেহুঁশ হয়েছিল—তখন কেন ডাক্তার দেখাননি?' সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে করতে সতু বশ্বি আবার প্রশ্ন করে।

'খোকার বাবা বলল, দু-একদিন যাক তারপর জ্বর না সারলে ডাক্তার দেখাবে। জ্বর হল আর ডাক্তারের বাড়ি ছুটলাম এ রকম অবস্থা তো আর আমাদের নয়।' অপরাধ অস্বীকার মেয়েলোকটি করে না।

'তাহলে হাম যখন বের হল তখন ডাক্তার দেখালে না কেন?' সতু বশ্বি প্রশ্ন করে।

'খোকার বাবা বলল, এ হল মায়ের দয়া। এতে ডাক্তার দেখালে দোষ হয়—তাইতে আর দেখানো হল না।' যুক্তির অভাব মেয়েলোকটির হয় না।

'পরশু যখন থেকে শুরু হল অন্তত পক্ষে তখন দেখালেও পারতে তো? সতু বদ্যি ক্রমশই বিরক্ত হয়ে ওঠে।

'খোকার বাবা বলল, এই তো জ্বর হল, দু-একদিন দেখি। তাও তো আজ আনতে পারতাম না ডাক্তারবাবু। খোকার বাবা ডাক্তারখানায় নিয়ে আসবে বলেছিল বিকেলবেলা। কিন্তু সেই সকালবেলা বেরিয়েছে আর সন্ধ্যে হয়ে এল ফেরার নামটি নেই। শেষে ওঘরের কেলোর মা আসছিল তার সঙ্গে এই আট আনা পয়সা হাতে করে এলুম।' খোকার বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ আর এবার অস্পষ্ট থাকে না।

সতু বদ্যি ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দেয়। সামান্য একটু চিৎকার করে বাচ্চাটা চুপ করে যায়। বেশী চেঁচাবার ক্ষমতা ওর আর নেই।

বিরক্ত সতু বদ্যি সত্যিই হয়েছে। এখন না হয় পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছে। তা না হলে এ তো নিশ্চিত মৃত্যুর ব্যাধি।

যারা নিজের সন্তানের নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে তাদের সম্বন্ধে সহানুভূতি সতু বদ্যি কেন কোন বদ্যিরই হওয়া সম্ভব নয়।

'কাল কিন্তু আবার নিয়ে এস,' আট আনা পয়সা গুনে নিয়ে সতু বদ্যি বলে—'তোমাদের তো আবার ওজরের অভাব হয় না।'

মেয়েলোকটির পরম সততার সুরে বোঝা যায় সে সত্যি কথাই বলছে। সে কাল আবার তার বাচ্চাকে নিয়ে আসবে।

সতু বদ্যির রাগ কিন্তু তখনও পড়েনি।

'ওদের ওজর কি রকম জানেন?'

সতু বদ্যি ঘরভর্তি লোককে গল্প বলতে শুরু করে:

পুঁটিরামের মিষ্টির দোকান চেনেন? সেখানে এক খরিদ্দার এসে উপস্থিত। খরিদ্দার প্রথমে এসে জিজ্ঞাসা করল রসগোল্লার দর। শুনল, তিন টাকা করে। শুনে খরিদ্দার বলল—'বেশ দিন আমাকে আট সের।'

দোকানদার আট সের রসগোল্লা মেপে দিল। তখন খরিদ্দার প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা সন্দেশ কত করে?'

দোকানদার বলল, 'আট টাকা করে।'
'তাহলে বরং আট সের রসগোল্লার বদলে তিন সের সন্দেশই দিন। একই তো দাম হবে।'
লোকটির কথায় দোকানদার তখন রসগোল্লা রেখে সন্দেশই দিল। লোকটি দিব্যি সন্দেশ নিয়ে দাম না দিয়েই চলে যাচ্ছে তখন দোকানদার বলল, 'বাবু দামটা?'
'কিসের দাম?' লোকটির গলায় রীতিমত বিরক্তির স্বর।
'ওই যে সন্দেশ নিলেন বাবু?' দোকানদার অবাক হয়ে যায়।
'কেন সন্দেশ তো রসগোল্লার বদলে নিলাম।' খরিদ্দার রীতিমত গলা চড়ায়।
'তাহলে বাবু রসগোল্লার দামটা দিন' দোকানদার এবার ঘাবড়ে যায়।
'রসগোল্লার আবার দাম কি? রসগোল্লা তো ফিরিয়ে দিলাম।'
খরিদ্দার এবার সত্যি সত্যিই রেগে যায়।
খরিদ্দারেরও যুক্তির শেষ হয় না আর দোকানদারও দাম পায় না।
এই এদের যুক্তিও সেই রকম।
সতু বদ্যি গল্প শেষ করে।
ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে ওঠে। মেয়েলোকটি কিন্তু ততক্ষণে চলে গিয়েছে।

পরদিন মেয়েলোকটি আসে না। সতু বদ্যি তখনও নতুন ডাক্তার। রোগীর জন্যে ওর চিন্তাও খুব বেশী। মরে যে যায়নি তা ও বুঝতে পারে। কারণ তাহলে ডেথ সার্টিফিকেট নিতে নিশ্চয়ই আসত। তাহলে কেন এল না? বস্তির এই সমস্ত অশিক্ষিত লোকগুলির না আছে দায়িত্বজ্ঞান না আছে বুদ্ধি।
অগত্যা সন্ধ্যার পর সতু বদ্যিই রওনা হয় রোগী বাড়ি—অনাহূত। বস্তিতে কেলোর মায়ের ঘর সতু বদ্যির চেনা। কেলোর মাকে নিয়ে রোগী বাড়ি হাজির হয়।
সতু বদ্যিকে দেখে ঘরসুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এত বড় এম-বি ডাক্তার বস্তিতে সচরাচর আসে না।
আর মেয়েলোকটি এক এক করে তার ওজরগুলো শুরু করে।
খোকা একটু ভালো আছে। জ্বর তো নেইই তাছাড়া নিশ্বাসের কষ্ট, কাশি

সবই বেশ কম। আর কালকের ইন্‌জেকশনেরই দাম যোগাড় করতে পারেনি, আজ আবার ইন্‌জেকশন দিতে যায় কোন্ লজ্জায় ?
ওজরে বিরক্ত হলেও রোগী পরীক্ষা করে সতু বদ্যি সত্যিই খুশি হয়। জয় বাবা স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর। একটা প্রোকেন পেনিসিলিনেই এত উন্নতি। কিন্তু তার উপরে বিশ্বাস করা উচিৎ নয়।
সতু বদ্যি আর একটা ইন্‌জেকশন দেয়।
'আমার ফি তোমায় দিতে হবে না। তুমি তো আমাকে ডাকনি আমি নিজেই এসেছি। কিন্তু দুটো ইন্‌জেকশনের দামের বাকি সাড়ে সাত টাকা দিয়ে দিও। আর কাল খবর দিও।'
সতু বদ্যি ব্যাগ বন্ধ করে।
'আমার খোকার জীবন আপনি দিয়েছেন—ডাক্তারবাবু আপনার ঋণ যে করে হোক আমি শোধ করব। যদি আপনার দোরে গতর খাটিয়ে শোধ করতে হয় ডাক্তারবাবু........'
মায়ের বকবকানি শোনবার জন্যে আর সতু বদ্যি অপেক্ষা করে না। গট গট করে রওনা হয় বস্তি ছেড়ে।
পর দিন খবর দিতে মেয়েলোকটি অবিশ্যি আর আসেনি। তার পরদিনও না। এমন কি তার পরদিনও। এসেছে আজ বিকেলে।
পনেরো দিন পরে।
'কী ব্যাপার ? আমার দোরে গতর খাটাতে এসেছ ? না টাকা নিয়ে এসেছো ?' মেয়েলোকটিকে দেখেই সতু বদ্যি জ্বলে ওঠে। ওর ফি দেয়নি —আচ্ছা না হয় নাই দিল। ওর পেনিসিলিনের দাম দেয়নি, আচ্ছা গরীব মানুষ না হয় তাও না দিল। কিন্তু একটা খবর তো দিতে পারত। গরীব মানুষ কিন্তু তাই বলে বাচ্চাটার খবর দিতে তো আর পয়সা লাগে না।
মেয়েলোকটি কিন্তু লজ্জা পাবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না। সটান এসে সতু বদ্যি পালিয়ে যাবার আগেই তার পা দুটো বেশ মোক্ষমভাবে জড়িয়ে ধরে গড় গড় করে কথা বলতে শুরু করে।
ও নিজে বোকা, গাধা ইত্যাদি। ছোটলোক, মানুষ নয়। সতু বদ্যির জুতোর তলায় থাকবারও যোগ্য নয়। ভগবান ওকে ওর অপরাধের জন্যে প্রচুর শাস্তি দিয়েছেন। এখন এক সতু বদ্যি ছাড়া ওকে আর কেউই রক্ষা

করতে পারবে না। কারণ সতু বদ্যি হল সাক্ষাৎ ভগবান। ওর ছোট বাচ্চাটার আবার জ্বর হয়েছে। ঠিক গতবার সতু বদ্যি যেমন দেখেছিল তেমনি। সতু বদ্যি দয়া করে........।

মেয়েলোকটি বলেই চলে। সতু বদ্যির রাগ কিন্তু মোটেই কমে না। ওদের বাড়ি যাবার ইচ্ছে আর ওর একটুও নেই।

কিন্তু তাতেও কতকগুলো মুশকিল আছে। সতু বদ্যি জাত বদ্যি। তার বাপ, ঠাকুর্দা যদিও মেডিকেল কলেজের পাশ-করা ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু তার উপরে ছিল সব কবিরাজ।

সতু বদ্যি যখন মেডিকাল কলেজে ঢোকে তখন তার বাবা ওকে কতকগুলো উপদেশ দিয়েছিলেন। সতু বদ্যি সেই উপদেশগুলো প্রায় আদেশের মতই মেনে চলে। তার ভিতরে এই রকম সব উপদেশ ছিল:

'তোর বাড়িতে রোগী এসে যদি কখনও তোর অপরাধে ফিরে না যায় তাহলে লক্ষ্মীও কখনও তোর বাড়ি থেকে যাবেন না।'

'ব্যাঙ্কে কত টাকা তোর জমল সেটা তোর পুঁজি নয়। কটা রোগী সারিয়েছিস সেইটেই তোর আসল পুঁজি।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই জন্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সতু বদ্যিকে উঠতে হয়।

মেয়েলোকটি তো হাঁটছে না—যেন দৌড়চ্ছে। তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে সতু বদ্যিকেও প্রায় দৌড়তে হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে বস্তিতে এসে সতু বদ্যি হাজির হয়।

'আরে এ তো সেই বাচ্চাটাই। অসুখও তো একই রকম মনে হচ্ছে। কিন্তু হামের দাগগুলো তো এক রকমই আছে। এতদিনে তো অনেক কম হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

সতু বদ্যির খানিকটা প্রশ্ন আর খানিকটা স্বগতোক্তি।

না, না এ সে বাচ্চা নয়। এ হল তার ছোট। আর আগের বাচ্চাটার বয়স ছ-মাস নয় প্রায় দু-বছর। গরীবের ছেলে তো, খেতে পায় না। তাইতে বাড়টা একটু কম।

খোকার'মা ব্যাখ্যা করে।

তা করুক—কিন্তু এ বাচ্চাটাকে বাঁচানো বোধ হয় প্রায় অসম্ভব। নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ—চেষ্টা করলে বোঝা হয়তো যায় কিন্তু গোনা যায় না। আঙুলের ডগা ঠোঁট সব নীল হয়ে গিয়েছে।

কেন আগে ডাকেনি সতু বদ্যিকে ?

সেই আগের ওজরগুলো তো রয়েইছে। তাছাড়া গতবারই টাকা দিতে পারেনি এবার আবার মুখ দেখাবে কোন্ লজ্জায়।

এখন তাহলে ডাকল কি করে ?

এখন যে ছেলের প্রাণ যায়। ছেলের জীবন বিপন্ন হলে কি আর মায়ের লজ্জা সরম থাকে ?

মেয়েলোকটির ওজরের অভাব হয় না। কিন্তু সতু বদ্যির উপায়ের অভাব সত্যিই হয়।

পেনিসিলিন দেয়া হয়। কোরামিন দেয়া হয়। ইউকরটোন দেয়া হয়। যত রকম উপায় সতু বদ্যির শাস্ত্রে আছে সবই সতু বদ্যি গ্রহণ করে। কিন্তু আধঘণ্টা রোগী আগলে বসে থাকবার পর সতু বদ্যিকে প্রস্তুত হতে হয় ডেথ সার্টিফিকেট লেখবার জন্যে।

মেয়েলোকটি আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে—চিৎকার করে তার সন্তানের জন্যে। পড়শী মেয়েরাও শুরু করে সহানুভূতিসূচক কান্না। মুহূর্তে বস্তিটা হয়ে ওঠে একটা মেছোহাটা।

সতু বদ্যি নির্বিকার। সে ডেথ সার্টিফিকেট লেখে খুব সাবধানে। ভুল হলে আবার সৎকারের অসুবিধা।

সতু বদ্যি ভাবছে সার্টিফিকেটটা কার হাতে দেবে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হয় আর একটি লোক। লম্বা লম্বা চুল, তেল দিয়ে জবজবে করে আঁচড়ানো। প্যারাসুট সিল্কের আধময়লা চকচকে শার্ট গায়ে। ধুতিটা পরবার কায়দাও বেশ জুতসই।

এসেই লোকটা চিৎকার করে ওঠে 'ওরে আমার খোকারে........'

সতু বদ্যি বুঝতে পারে এই হল খোকার বাবা।

'ওহে এই সার্টিফিকেটটা রাখো। সৎকার তো করতে হবে। গাধার মত চেঁচিয়ো তারপর।' কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই সতু বদ্যির ওর উপরে। ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সতু বদ্যির মনে হয় যেন একটা পিশাচ দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি বুঝি ডাক্তারবাবু ?' একটা হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে লোকটা অন্য হাত বাড়ায় সার্টিফিকেট নেবার জন্যে।

'মরে যাবার পর আর আমাকে ফি দিতে হবে না। বেঁচে থাকতে দিল না ভাত এখন চিতেয় দেবে মট। হারামজাদা উল্লুক।'

গ্যাট গ্যাট করে বেরিয়ে আসে সতু বদ্যি।
আসতে আসতে শোনে ওই লোকটা সান্ত্বনা দিচ্ছে খোকার মাকে ঃ
কেঁদে আর কোন লাভ নেই। মরে যখন একবার গিয়েছে, আর তো বাঁচবে না। আর তাছাড়া ও বেঁচে থাকতে খোকার মায়ের অভাব কি? আবার হবে; আরো হবে........!
পিশাচ........!
'ডাক্তারবাবু শুনুন, বস্তিটা ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়বে এইরকম সময় একজন পেছু ডাকে। সতু বদ্যি চিনতে পারে—এই বস্তিরই মোড়ল গোছের একটি লোক।
না, কোন রোগীর জন্যে দরকার নেই। তবে হ্যাঁ ওই যে বাচ্চাটা মারা গেল তার বাবাকে যে সতু বদ্যি গালাগাল করেছে বেশ করেছে। ও একটা শয়তান—পিশাচ। ওর আছে ষাট-সত্তরখানা জাল রেশন কার্ড। তা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে ও ব্ল্যাকমার্কেটে বিক্রি করে। তাছাড়া সুযোগ পেলে চুরি পকেটমারা কিছুতেই পেছপা হয় না। যথেষ্ট পয়সাও রোজগার করে। অথচ দেখবে না নিজের ছেলেদের। তাড়ি খেয়ে হল্লা করে আর যত নোংরামি করে। হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুর দয়ার শরীর, তা বলে ও লোকটার টাকা ছেড়ে দেয়া উচিৎ হয়নি ডাক্তারবাবুর। ও তো পিশাচ শয়তান। আচ্ছা ডাক্তারবাবুই বলুন—ওই খোকার মা না হয় ওর বিয়ে করা বউ নাই হল কিন্তু বাচ্চাগুলো তো ওর নিজের। তাদের তো দেখা উচিত। কিন্তু ও এইরকম। আর এ তো খুন—একি আর অসুখের মৃত্যু? খুনীকে আবার দয়া কিসের?
লোকটা সতু বদ্যির ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে দেয় সতু বদ্যিকে তার বাড়ি অবধি। সতু বদ্যিও আজ রেগে আছে তাইতেই। টাকা লোকসান হয়েছে বলে নয়। লোকটা সতু বদ্যিকে ঠকিয়েছে, বোকা বানিয়েছে সতু বদ্যিকে। ঘোল খাইয়েছে সতু বদ্যিকে।
টাকা গিয়েছে তাতে দুঃখ নেই কিন্তু বোকা বানাবে সতু বদ্যিকে? মধুসূদন কবিরাজের বংশধর সতু বদ্যিকে? মেডিকাল কলেজের—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত সতু বদ্যিকে বোকা বানাবে বস্তির একটা সাধারণ চোর?
তাইতেই সতু বদ্যি জ্বলে জ্বলে ওঠে, মানুষ চেনা সত্যিই বড় মুশকিল। বিপদগ্রস্ত দরিদ্র সাধারণ লোককে সাহায্য করবার জন্যে সতু বদ্যির সবসময়ই আগ্রহ

প্রচুর, কিন্তু সেই সুযোগ নিয়ে মানুষের সবচেয়ে মহৎ প্রবৃত্তিকে নিয়েও এরা ব্যবসা করবে ?
সতু বক্সি জ্বলে জ্বলে ওঠে।
তবে হ্যাঁ ডাক্তারের খপ্পরে হয়তো আবার পড়তে হবে ওদের তখন ওদের বেশ ভালো করে শিক্ষা দিয়ে দেবে সতু বক্সি।
তখন আর ঠকবে না।

দিন সাতেক বাদে বিকেল বেলা সতু বক্সি যখন ডাক্তারখানায় বসে রোগী দেখছে সেই পিশাচটা ঘরে ঢোকে। বস্তির সেই সাক্ষাৎ শয়তানটা। ঠিক সেই রকমই লম্বা লম্বা চুল—তেল জবজবে। ঠিক সেই রকমই কায়দা দুরস্ত ধুতি আর চকচকে প্যারাস্যুট সিল্কের চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়ে।
তবে কোলে একটা ন্যাকড়া জড়ানো পোঁটলা মত কি—আর সঙ্গে খোকার মা।
সতু বক্সি মনে মনে ভেবে নেয় এই ধূর্ত পিশাচকে কায়দা করার কায়দাটা। হাতের রোগী দেখা শেষ করে সতু বক্সি ডাক দেয় পিশাচকে।
'কী চাই তোমার ?' একটু উচিত শিক্ষা দেয়া দরকার লোকটাকে।
'এই বাচ্চাটা········'
'আগের টাকা এনেছ আমার ? আর আজকে আমাকে রোগী দেখানোর ফি ? আগাম টাকা না দিলে তোমার মত চোরকে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না····' এতদিনে সতু বক্সি বাগে পেয়েছে লোকটাকে।
'কত টাকা ডাক্তারবাবু ?' বেশ সপ্রতিভ কিন্তু পিশাচটা।
'তোমার বড় বাচ্চাটার দরুন দুটো ফি, আট টাকা—পেনিসিলিনের জন্যে সাড়ে সাত টাকা আর আজকের ফি চার টাকা—মোট এই সাড়ে উনিশ টাকা টেবিলে জমা দেবে তবে আমি রোগী দেখব। তবে হ্যাঁ যে মরে গিয়েছে তার জন্যে আমি কিছু চাই না। তোমার মত পিশাচ তো আর সবাই নয়····' বেশ হিসাব করে চিবিয়ে চিবিয়ে সতু বক্সি বলে। এত তাড়াতাড়ি যে লোকটাকে বাগে পাবে সতু বক্সি ভাবেনি। দাদ চুলকানোর মত আরাম পায় সতু বক্সি—কথাগুলো বলতে।
লোকটা পকেট থেকে বার করে একটা চকচকে মনি ব্যাগ। মনি ব্যাগের পেটটা ফুলে আছে কোলাব্যাঙের মত। তারপর গুণে গুণে টেবিলের উপর

সাজিয়ে রাখে উনিশ টাকা আট আনা—আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলি, ইত্যাদি।

'আপনি দেবতা ডাক্তারবাবু····এই শিশুটার তিন-চার দিন মাত্র বয়স হয়েছে। ওর মাও মরে গিয়েছে। আপনি ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না ওকে।'

'ওকে আবার কোথায় পেলে?' বাচ্চাটা এত বেশী ফর্সা আর সুন্দর যে মোটেই মানায় না ওই পিশাচের কোলে।

ওই হাজরা রোডের ওখানে একটা বস্তি আছে। সেখানে ওর মা থাকত। এখানে সেখানে খেটে খেত। আর ওই যে পাশে ওদিকে ফিরিঙ্গি সাহেবদের বাড়ি আছে সেখানেও কাজ করত। রাত্তিরে মাঝে মাঝে থাকতও ওদের ওখানে। ওরা ওকে অনেক ভালো ভালো জিনিসও দিত।

কিন্তু বাচ্চার বাবা যে কে তা বস্তির কেউই বলতে পারে না। ওর মা মরে গিয়েছে প্রসব হতেই। পাঁচী দাই আছে হাজরা বস্তিতে, সেই প্রসব করিয়েছিল, বাচ্চাটাকে দেখবার কেউ নেই। ঐ ফিরিঙ্গি সাহেবরা বড় লোক। তাদের বাড়ি গিয়েছিল তারাও হাঁকিয়ে দিয়েছে।

বাচ্চাটা খালি কাঁদে শুয়ে শুয়ে। আবার খোকার মায়েরও বাচ্চাটা মরে গিয়েছে—সেও দিনরাত শুয়ে শুয়ে কান্নাকাটি করে। তাইতে ও ভাবল দুজনকে যদি এক সঙ্গে রাখা যায় তাহলে হয়তো দুজনেরই কান্না কমতে পারে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে ওই খোকার মাকে নিয়ে। ওর বুকে দুধ নেই একটুও। তাইতে ডাক্তারবাবু যদি একটু বুঝিয়ে দেন কি করে পালতে হবে।

খরচপত্র যা লাগে লাগবে—তাতে আর কি করা যাবে। খোকা বেঁচে থাকলে তার জন্যেও তো খরচ হত। তাকে তো আর অভাবের সংসার বলে ফেলে দেয়া যেত না····।

পিশাচটার চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। চকচকে প্যারাসুট সিল্কের পাঞ্জাবীর চুড়িদার হাতা দিয়ে ও একবার মুছে নেয় চোখদুটো।

এই যে সামান্য সময়—না? এর ভিতরে হয়েছে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ও যখন কথাগুলো বলছে সতু বক্সির তখন হচ্ছে মুখের পরিবর্তন। কোঁচকানো ভুরুর ভাঁজগুলো পাতলা হয়ে এসেছে····পাতলা আর সহজ। কপালের বিরক্তির রেখাগুলো মিলিয়ে গিয়েছে, ফিরে এসেছে সতু বক্সির স্বাভাবিক মিষ্টি ভাব।

সতু বক্সি বাচ্চাকে পরীক্ষা করে, প্রশ্ন করে তার নতুন বাপ-মাকে।

তারপর লিখতে শুরু করে—

সময়	
৬	
৯	গোরুর দুধ…… …
১২	চিনি………
৩	জল………
৬	
১০	

পাশে পরিমাণ লিখতে গিয়ে সতু বক্সি একবার তাকায় সামনে চোরা দৃষ্টিতে। অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার, পিশাচটা পালিয়ে গিয়েছে। সামনে যে বসে আছে সে পিশাচ নয়।

তবে?

দেবতা?

না দেবতাও নয়।

রক্তে মাংসে গড়া, দোষে গুণে মেশানো—মানুষ, সাধারণ মানুষ।

সতু বক্সি আবার ঠকেছে।

জলপিঠ্‌ঠি কা কহানি

কলেরা বড় বিশ্রী অসুখ। একে তো অসুখটা সংক্রামক—একবার যদি শুরু হল তাহলে যতক্ষণ না ঝেঁটিয়ে পাড়া থেকে বিদেয় করা যাবে ততক্ষণ ছাড়বার নামটিও করবে না।

তার উপরে তার চিকিৎসা করা আরো ঝকমারি। কলেরার বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হল শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন দেয়া। তারই কি কম হাঙ্গাম—প্রথমে তো কলেরা হলে রুগীদের শিরা চুপ্‌সে চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। সেই শিরা ফুটিয়ে—স্যালাইনের স্থঁচ ঢোকাতে খুব আচ্ছা আচ্ছা ওস্তাদেরাও হিমশিম্ খেয়ে যায়।

আর এমনি আপসে স্থঁচ ঢুকলো তো ঢুকলো না হলে আবার কেটে শিরা বার করে সেই শিরায় স্যালাইন দিতে হবে।

যাই হোক স্থঁচ তো ঢুকলো—কিন্তু তারপরেও নিস্তার নেই। রোগীর নাড়ী ঠিক হবে, রোগী প্রস্রাব করবে—মানে মোটামুটি রোগী সুস্থ হবে তারপর ডাক্তারের ছুটি। আর তাছাড়া এক হাতে স্যালাইনের নল আর এক হাতে রোগীর নাড়ী ধরে বসে থাকতে হবে। সে দু-ঘণ্টাও হতে পারে আবার দু-দিনও হতে পারে। আর এত করেও কটা টাকাই বা পাবে সতু বক্সি? ত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা, বড় জোর হয়তো ১০০৲ টাকা, তার জন্যে নোংরা বস্তিতে রুগী আগলে বসে থাকতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়তো রাতদিন হয়তো আরও বেশী। আর সে কী রুগী! পায়খানা আর বমি করে সৃষ্টি নোংরা করছে, সৃষ্টি মানে শুধু যে ঘর বিছানা তাই নয়—সতু বক্সিও তার ভিতরে পড়ে।

আর তার ভিতরে বসে থাকতে হবে সতু বক্সিকে, বস্তির ঘর দুপুরের রোদে তেতে আগুন হয়ে উঠবে। হাত ঘামবে, পা ঘামবে, হাওয়াই শার্ট আর গেঞ্জিও ভিজে জব জব করবে। কপালের ঘাম টুপ টুপ করে চোখে পড়বে —চোখটা চিড়বিড় করে জ্বলে উঠবে।

আর তার ভিতরে সতু বক্সি বসে স্যালাইন দেবে।

এতে অনেক পয়সা সতু বক্সি পায় না। আর পয়সা পেলেও একাজ সতু বক্সি পছন্দ করে না, কিন্তু কি করবে? পেশা পেশা।

এবার ফাল্গুন মাস অর্থাৎ পক্স্ সিজন্ শুরু না হতেই মানে বসন্ত কালের মাঝামাঝি থেকেই সতু বক্সি শুরু করেছে কলেরা-বিরোধী অভিযান।

সতু বক্সি বিশ্বাস করে তার বিজ্ঞানের অসীম ক্ষমতা। কলেরা কেন হয়—কে কে তার মিত্র আর কি কি তার শত্রু সবই বিজ্ঞান জানে স্নুতরাং সেই বিজ্ঞানের সাহায্যে সতু বক্সি এবার ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে কলেরাকে।

দিনের পর দিন সতু বক্সি, সাঙ্গোপাঙ্গ ও পাড়ার ছেলেরা বুড়ো, হাবলি, মিচকে, ভোঁদড় সবাই মিলে লেগে গিয়েছে কলেরার ইন্‌জেকশন দিতে।

বস্তিগুলোতে আছে দারিদ্র্য আর অজ্ঞতার আদিম জঙ্গল। স্নুতরাং সেখান থেকে যদি কলেরা বিদায় করা যায় তাহলে গোটা পাড়াই বেঁচে যায়।

স্নুতরাং বস্তিগুলোতেই সতু বক্সির আক্রমণ শুরু হয়েছে প্রথম।

কিন্তু শুধু কলেরার ইন্‌জেকশন দিলেই তো আর কলেরা বন্ধ হয় না।

যে কোন রোগ সৃষ্টির মূলে আছে দুটো জিনিস—ক্ষেত্র আর বীজ।

ক্ষেত্র যদি উর্বর না হয় তাহলে তাতে যত বেশী বীজই পড়ুক না কেন রোগ সৃষ্টি কিছুতেই হবে না আর ক্ষেত্র যদি উর্বর হয় তাহলে একটা বীজ থেকেই সেখানে মহীরুহ মানে এসিয়াটিক কলেরার সৃষ্টি হতে পারে।

স্নুতরাং সতু বক্সি শিখিয়েছে সাঙ্গোপাঙ্গাকে। কি করে জল আর খাদ্য মারফৎ কলেরা বীজাণু দেহে প্রবেশ করে, কি করে মাছি নোংরা জায়গা থেকে খাদ্য বীজাণু বহন করে—কি করে রোগীর কিংবা রোগবাহী সুস্থ লোকের মল থেকে কলেরা রোগ ছড়াতে পারে—সব শিখিয়েছে সাঙ্গোপাঙ্গাকে।

সাঙ্গোপাঙ্গা আবার শিখিয়েছে বুড়ো, হাবলি, মিচকে, ভোঁদড় সবাইকে।

স্নুতরাং বস্তির মেয়েলোক আর পুরুষলোক, বয়স্ক আর শিশু, বাড়িওলা আর ভাড়াটে, কারখানার কুলীন মজুর আর গেরস্তবাড়ির অন্তজ ঝি—সবাইকে বক্তৃতায় অস্থির করে তুলেছে সতু বক্সির দলবল।

কিন্তু দেখুন তো কী গেরো, এবারও কি না সেই কলেরা? আর এই বস্তি-গুলোর ভিতরে কিই বা করা যাবে। চৈত্র মাসে যাদের ইন্‌জেকশন দিয়েছে বালিগঞ্জে, বৈশাখ মাসে হয়তো তারা চলে গিয়েছে তিলজলায়। সতু বক্সি ধরে কাকে?

তাইতে এখন আবার স্যালাইনের বোতল নিয়ে ঘুরতে হবে দিনের পর দিন—রাতের পর রাত।

হ্যাঁ যে কথা হচ্ছিল।

রাত তখন দুটো আড়াইটে হবে। সারাদিন রুগীর হাঙ্গাম পুইয়ে—ছাপান্ন ইঞ্চি পাখাটা মাথার উপর টপ স্পিডে চালিয়ে দিয়ে সতু বদ্যি ঘুমুচ্ছে। চারদিকে নিঝুম। কোন সাড়া শব্দ নেই। খালি সতু বদ্যির জানলার ফাঁক দিয়ে নীল আলো আর নাক ডাকার আওয়াজ। বোঝা যায় এখানে মনুষ্য বসতি আছে। এমন সময় ডাক পড়লো—'ডাক্তারবাবু, ডাক্তার বাবু!'

কোন সাড়া নেই।

কিন্তু তারপরেই যা আওয়াজ শুরু হয়—মনে হয় যেন বাঘে তাড়া করেছে। 'ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু···'

সতু বদ্যি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে 'কে?'

সতু বদ্যির বাড়ির পিছনের বস্তি থেকে এসেছে। বাড়ির পিছনের বস্তিটা? সেখানে যে লালার দোকান? তার পিছনে তিলকধারীর খাটাল? তার পিছনে শৈলী বাড়িউলির বাড়ি? সেইখানে থাকে। ওর বউয়ের অসুখ করেছে। প্রায় আধঘণ্টা হল খালি বমি হচ্ছে, পায়খানা হচ্ছে। কী পায়খানা আর বমি! এই আধঘণ্টার ভিতরে তিন চারবার বমি আর তিন চারবার পায়খানা করেছে আর এক একবার এক এক কাঁড়ি। এই দেখুন না। ও শুয়েছিল বউয়ের পাশে, একবার বমি করল—করবি তো কর ওর গায়েই। দেখছেন না? ওর কাপড় জামা ভিজে একশা।

কাপড় জামা কতটা ভিজেছে দেখাতে লোকটা এগিয়ে আসে।

'আরে করো কি? করো কি? আমি দেখেছি।' সতু বদ্যি আঁতকে ওঠে, 'দাঁড়াও আমি আসছি।'

দো ফেত্তা দিয়ে কাপড় জড়িয়ে একটা জালি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে সতু বদ্যি বেরিয়ে আসে।

'ধরো' ব্যাগটা সতু বদ্যি লোকটির হাতে এগিয়ে দেয়।

রাস্তায় যেতে যেতে সতু বদ্যি ঝিমোয় আর লোকটির ঘরের খবর সংগ্রহ করে। লোকটা চানাওয়ালা। ছোলা ভাজা, ছাতু, মকাই ভাজা এই সব বিক্রি করে। কোথায় বিক্রি করে তা ঠিক নেই—কোন দোকান তো আর নেই। আজ হয়তো লালার দোকানের সামনে তেঁতুলতলায় রামলীলার গান

হল সেখানে চানা বিক্রি হল। আবার কাল হয়তো লাইনের ওপারে বীরহা হল সেখানে চানা বিক্রি হল। বীরহা জানে না ডাক্তারবাবু? চানাওয়ালার দেশের লোক বীরহা খুব পছন্দ করে। বীরহা মানে বীরের কাহিনী। বীর মানে রামজী—মহাবীরজীও হতে পারে আবার গান্ধী মহারাজও হতে পারে। সে সুর-টুর করে, ঢোল-টোল বাজিয়ে বীরহা হয়। ডাক্তারবাবু ভি বড়লোক আছে। মানে ডাক্তারবাবু তো ঠিক আদমী নয়—কমসে কম আধা হিস্‌সা দেওতা। চাই কি ডাক্তারবাবুর নামে ভি বীরহা হতে পারে।

আজ লাইনের ওপারে বীরহা ছিল। সেখানে চানা-টানা নিয়ে গিয়েছিল। বিক্‌রি-বাট্টা ভি কিছু হল আবার বীরহা ভি শোনা হল। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। কত রাত? ঘড়ি তো নেই ডাক্তারবাবুদের মত লেকিন বারোটা-একটা হবে।

ফিরে খাওয়া দাওয়া করে ও ঘুমিয়েছে। বিচমে ও আর বিবি। বিবির বগলে ছোট বাচ্চা—আর ওর বগলে বড় বাচ্চা। ধরে লিন দুটোই বাচ্চা ওদের।

হঠাৎ সেই বমি ওর গায়ের উপর গিরেছে। গরম গরম ঠান্‌ডাহ ঠান্‌ডাহ গিরে ওর নিদ টুটে গেল। পরথম, পরথম, দু-একবার ঝাড়া ফিরতে বাইরে গিয়েছিল। লেকিন এখন আর উঠতে ভি পারছে না। আর কথা পর্যন্ত বসে গিয়েছে। চুহার মত চিঁহি চিঁহি আওয়াজ করছে।

সতু বক্সি বস্তিতে পৌঁছে যায়।

বিজলী বাতি লালার দোকানে একটা আছে লেকিন ওর দোকানে নেই। তবে একটা ডিবরী আছে। খুব ভালো ভি আছে আর বড় ভি আছে। ওর চানা বিক্রির ডিবরী। পৌয়াভর তেল আঁটে তাতে। সে বিজলী বাতিসে ভি আচ্ছা। তাতে ডাকডর বাবুর চলে যাবে।

অন্ধকার?

না অন্ধকারে সতু বক্সির ভয় নেই। সঙ্গে টর্চ রয়েছে।

তবে সাপ নেই তো?

না না। সাপ কোথা থেকে আসবে? একি মুলুক? এ হল কলকাতা শহর। এখানে সাপ থাকবে কোথা থেকে? তবে হ্যা, নালহা-টালহা দু-একটা আছে। বড় গন্দা। ডাকডর সাহেব পা-টা যদি একটু সামালিহে আসেন তাহলে কোন ভয় নেই।

আর তাছাড়া ও চলবে আগে আগে। পথ দেখাবে। তবে হ্যাঁ—বদবু থোড়া আছে। সে ডাকডরসাহেব তো রুমাল নিয়ে এসেছেন। রুমালটা নাকে দিলেই ব্যস। রুমাল নয় তবে কোঁচার খুঁটটা নাকে দিয়ে সতু বশ্বি ঘরে ঢোকে। ঘরটা ছোট। মানে চারজনের শোবার মত নয়।

মানে চারজন যদি পাশাপাশি শোয়, ঘেঁষাঘেঁষি করে শোয়, একটা বিছানায় শোয় তাহলে আঁটবার কথা নয়।

লেকিন সবাইকে যে চিত হয়ে শুতে হবে তার কোন মানে নেই। কাত হয়ে ভি শোয়া যায়। আর উপরে যে দোলনা ঝুলছে। চট আর ডোরা দিয়ে বানিয়েছে। তাতে ভি বাচ্চারা শুতে পারে।

টাট্টি-পিসাব করলে ?

সে আর কি করবে ? ও তো বাপ-মায়ের গায়ে থোড়া গিরেই থাকে।

সতু বশ্বি রোগী পরীক্ষা করতে শুরু করে। চোখটা বসে গিয়েছে। জিবটা শুকনো খট্‌খটে কাঠের মত। গলার স্বরটাও কেমন ভাঙা ভাঙা। নাড়ী কব্‌জিতে নেই তবে কনুইয়ের কাছে আছে। খুব হাল্‌কা যদিও, আঙুল রাখলেই মনে হয় চুপসে যাবে। তবে বগলের নাড়ীটা বেশ ভালো ভাবে পাওয়া যায়। আর একটা গন্ধ। মাছধোয়া জল যদি একটু বাসী হয়ে যায় তাহলে যে রকম গন্ধ হয় অনেকটা সেই রকম গন্ধ।

গন্ধটা অবশ্য ভাষায় বোঝানো মুশ্‌কিল—তবে অনেকটা কলেরা কলেরা গন্ধ।

যাই হোক মোটামুটি বোঝা যায়' এটা কলেরা। ভেজালহীন বনেদী জাত কলেরা। এখন উপায় কি ? এখুনি অবিশ্যি চিকিৎসা শুরু করে দেয়া যেতে পারে কিন্তু চিকিৎসাতেও বখেড়া কম নয়। ধরুন এ্যাট্রিগিন, পার-করটেন, স্যালাইন, এ সব তো আছেই আবার টেরামাইসিন প্লাজমোসান এ সবও লাগতে পারে। তার উপরে আবার আছে গোদের উপর বিষফোড়ার মত সতু বশ্বির মজুরি।

সুতরাং দু-তিনশ টাকা নগদ যার হাতে নেই তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়া বড় মুশ্‌কিল।

হাসপাতালে পাঠানো যায়। কিন্তু টেলিফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে হাস-পাতালে পাঠানো, তার মানে চিকিৎসা শুরু হতে হতে আরও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। এতক্ষণ কি রুগী টিকবে ? সতু বশ্বি করে কি ?

সতু বদ্যি জাত বদ্যি। কোন্ রোগীর কি চিকিৎসা তা বেশ ভালোই জানে, পূর্বপুরুষদের কাছে শিখেছে। মেডিকাল কলেজে শিখেছে, নিজে কাজ করতে করতে দেখে.শিখেছে। ঠেকে শিখেছে।

কিন্তু কোন্ রোগের কি ওষুধ সে শেখা এক কথা আর পকেটে—মানে রোগীর পকেটে কত টাকা থাকলে কি ওষুধ তা শেখা অন্য কথা।

তা তো সতু বদ্যি শেখেনি।

তাইতে সমস্যা হল—সতু বদ্যি এখন করে কি ? জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘ।

মিনিট খানিক ভেবে সতু বদ্যি বুদ্ধি ঠিক করে নেয়।

চানাওয়ালা ডিবরী জ্বালে। পৌয়া ভর মিট্টিকা তেল ধরে এই রকম ডিবরী। তা ডিবরীতে বেশ আলো হয়। বিজলী বাতির মত নয় অবিশ্যি। তবে চানাওয়ালার মুখ দেখা যায়—তার বিবির মুখ ভি দেখা যায় আবার বদন ভি দেখা যায়। কিন্তু শিরাটা ঠিক দেখা যায় না। পায়ের রংটাও খুব ফর্সা নয় আর আলোটাও খুব বেশী নয়। কলেরা রোগীর শিরা তো। চুপসে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে। আম শুকিয়ে যে রকম আমসী হয় সেই রকম। তার উপরে বিবি যদি ফর্সা হত—মানে শিরাগুলো শুকিয়ে আমসী হলেও বিবি যদি মেম শুকিয়ে মেমসী হত তাহলে তবুও হয়তো চলতো—কোন অসুবিধা হত না।

হ্যাঁ, আলোটা ছাড়া অবিশ্যি এখানে সবই মুশ্‌কিল। এমন কি কপালের ঘাম গড়িয়ে গড়িয়ে চশমায় পড়ে চশমাটা অবধি ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। কপালেরই বা দোষ কি বলুন ?

কোথায় ছাপান্ন ইঞ্চি পাখা আর নীল আলো আর কোথায় শৈলী বাড়ি-উলির খুপরি, আর পৌয়া ভর তেলওলা ডিবরী।

তবে সতু বদ্যি ঘাবড়ায় না। চন্দ্রশেখর কবিরাজ মধুসূদন কবিরাজ মায় নরহরিদাস কবীন্দ্র বিশ্বাস সব পূর্বপুরুষের নাম করে সতু বদ্যি চালিয়ে দেয় সূঁচ।

ঠিক চলে যায়। বাবা সতু বদ্যির হাত।

তারপর বলে চানাওয়ালাকে।

ডাক্তারখানা থেকে সাঙ্গোপাঙ্গা অর্থাৎ কম্‌পাউণ্ডার বাবুকে ডেকে আনতে। মিনিট পনেরোর ভিতরে সাঙ্গোপাঙ্গা পৌছে যায়। সতু বদ্যি তাকে নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেয়।

অ্যাম্বুলেন্সে একটা ফোন করতে হবে। সাঙ্কোপাঞ্জা করছে এভাবে নয়। যেন সতু বত্তি নিজেই করছে এইভাবে। বস্তিতে শৈল বাড়িউলির বাড়িতে চানাওয়ালার বউয়ের কলেরা হয়েছে। কবজিতে নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। অবস্থা খুবই খারাপ। এখুনি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে হবে। স্যালাইন দেয়া হচ্ছে একথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করা না হয়।

সাঙ্কোপাঞ্জা বেরিয়ে যায়। টেলিফোন করবে। তারপর দাঁড়িয়ে থাকবে রাস্তার মোড়ে। অ্যাম্বুলেন্স এলে তাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে আসবে।

সতু বত্তি স্যালাইন দেয়। মাথার উপরে দোলনার দড়িতে ঝুলছে কাঁচের বোতল, তার নীচে রবারের নল। মাঝখানে কাঁচের নল আবার রবারের নল। তারপর সূঁচ এসে শেষ হয়েছে রোগীর শিরায়। মাঝখানের কাঁচের নল দিয়ে দেখা যায় স্যালাইন পড়ছে—টুপ্ টুপ্ টুপ্ টুপ্।

সতু বত্তি ফোঁটা গোনে আর নাড়ী দেখে। নাড়ী দেখে আর ফোঁটা গোনে। আর ঝিমোয়। মাঝে মাঝে ঝিমুনি ভেঙে চমকে ওঠে—হয়তো পা বেয়ে আরশোলা ওঠে। শিউরে ওঠে পা থেকে মাথা অবধি। নয়তো কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে চোখে পড়ে। চিড়বিড় করে জ্বলে ওঠে চোখ দুটো।

সতু বত্তি আবার ফোঁটা গোনে আর নাড়ী দেখে। আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

অন্ধকার আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসতে থাকে। বস্তির নিস্তব্ধতা ভেঙে আসতে থাকে। কলে জল আসে। ফটফট আওয়াজ হয়।

সতু বত্তি তাকিয়ে থাকে কলের সামনে কিউএর দিকে। আরো কিউ অবিশ্যি হয়—বস্তিতে সকালবেলা। কলের সামনে হয়—পায়খানার সামনেও হয়—আর সে কিউএ কোন ভেদাভেদ নেই।

আবাল বৃদ্ধ বনিতা আছে। আবার পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গও আছে। সতু বত্তি তাকিয়ে থাকে আর ঝিমোয়। কিচির মিচির ঝগড়ায় ঝিমুনিটা মাঝে মাঝে ভেঙে যায়। না পাখীর কিচির মিচির নয়—কলতলায় মেয়েদের কিচির মিচির।

সতু বত্তি স্যালাইনের ফোঁটা গোনে আর নাড়ী দেখে—আর ঝিমোয়।

ঝিমুনিটা পাকাপোক্তভাবে ভাঙে অ্যাম্বুলেন্সের হর্ন-এর আওয়াজে। সাঙ্কো-পাঞ্জা ঠিক অ্যাম্বুলেন্স ধরে এনেছে। বলে দরকার হলে ও সুন্দরবন

থেকে বাঘ ধরে আনতে পারে আর এ তো অ্যাম্বুলেন্স। এতক্ষণে রোগীর নাড়ী উঠেছে, রোগীর জিব ভিজেছে। রোগীর চোখও একটু ভেসেছে—গলার স্বরও একটু উঠেছে।
সুতরাং এখন রোগীকে যদি হাসপাতালে নিয়ে যায় তাহলে বাঁচবার সম্ভাবনা যথেষ্ট।
স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা চানাওয়ালার বিবিকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠায়।
আগে আগে যায় সতু বিশ্বি আর সাঙ্কোপাঞ্জা আর পিছনে আঙ্গোছা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আসে সেই বিবির মরদ চানাওয়ালা।
অ্যাম্বুলেন্স চলে গেলে সতু বিশ্বির খেয়াল হয়।
চানাওয়ালার কাছে টাকা আদায় করতে হবে। দরদস্তর একটু করতে হয়। দুনিয়াটাই এই রকম। সতু বিশ্বি একশো টাকা থেকে শুরু করে। তবে শেষ মেষ রফা হয় চোদ্দ টাকায়। কাগজের নোট আছে, রূপোর টাকা আছে, মায় সিকি দুয়ানি আনি পয়সা ভি আছে।
কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে গিঁট বেঁধে যত্ন করে টাকা পয়সাগুলো সতু বিশ্বি রাখে।
চলে যাবার সময় খেয়াল হয়—সাঙ্কোপাঞ্জাকে একবার দেখানো দরকার কলেরা রোগীর পায়খানা আর বমির চেহারা কিরকম। আর শুধু কি তাই? এই রোগী চলে যাবার পর সাঙ্কোপাঞ্জা যদি একটা বক্তৃতা দিতে পারে তাহলে হয়তো সতু বিশ্বির কলেরা-বিরোধী অভিযান অনেক এগুবে।
ইংরেজিতে বলেছে—'Strike the iron while it is hot' মানে লোহা গরম থাকতে থাকতেই তাকে পিটিয়ে তার রূপ পালটাতে হয়।
কিন্তু সারা ঘর খুঁজেও রোগীর পায়খানা পাওয়া যায় না—বমিও পাওয়া যায় না। কিছু পড়েছে রোগীর বিছানায় আর মেঝেতে আর কিছু পড়েছে চানাওয়ালা আর তার বাচ্চাদের গায়ে। সতু বিশ্বির গায়েও কিছু পড়েছে অবিশ্যি। সুতরাং কি করে আর সাঙ্কোপাঞ্জাকে দেখাবে?
'চাল ধোয়া জল দেখেছ? সাদাটে জল—মাঝে সাদা সাদা টুকরো টুকরো শ্যাওলার মত ভাসে? তোমাকে দেখাতে পারলুম না—কিন্তু এও ঠিক সেই রকম। আমাদের সাধারণ পায়খানার রঙ তো একটু হলদেটে থাকে কলেরার রোগীদের সেটা একদম থাকে না........'

সাঙ্কোপাঙ্গাকে বোঝাতে বোঝাতে সতু বস্থি বেরোয়। আরে, সামনেই দুটো বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। ঐ চানাওয়ালার বাচ্চা দুটো। দুজনের হাতে দুটো পিতলের বাটি আর বাটির ভিতরে কি যেন রয়েছে। জলের ভিতরে দু-একটা চাকা মত ভাসছে। ছেলে দুটো খাচ্ছে পরম তৃপ্তির সঙ্গে।
সাদা চালধোয়া জলের মত জলের ভিতরে কি যেন চাকা চাকা রয়েছে।
'ঠিক এই রকম বুঝলে সাঙ্কোপাঙ্গা—একেবারে এই রকম। ঠিক চালধোয়া জল। তবে ঐ চাকা চাকাগুলো থাকে না........'
এতক্ষণ পরে সতু বস্থির খেয়াল হয়—আরে! এগুলো তো ওরা খাচ্ছে।
'কা খাওতাড় রে?'
সতু বস্থির কথায় খানিকটা প্রশ্ন আর খানিকটা ধমক।
'জলপিঠ্ঠি খাওয়তানি বাবু' বড় বাচ্চাটা কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়। মুখের আর বাটির মাঝখানে তার ডান হাতটা আটকে যায়।
আটা মেখে নিয়ে লেচি করে সেগুলো নুন আর জলে সেদ্ধ করলে জলপিঠ্ঠি হয়, গরীব ভোজপুরী কুলিদের খাদ্য। যাদের অবস্থা ভালো তারা জলে সেদ্ধ করে না—তারা ডালে সেদ্ধ করে, তাকে বলে ডালপিঠঠি। তাছাড়া পুয়া ঠেকুয়াও হয়। কিন্তু সে তো আর আমীর ছাড়া কেউ রোজ রোজ খেতে পারে না। ছট্‌মে পুরা ঠেকুয়া চানাওয়ালার বাড়িতে ভি হোয় লেকিন সে তো শিউরাত হোলি তক খাওয়া যায় না। তাইতে ওরা জলপিঠঠি যায়।
সতু বস্থি পালিয়ে আসে।
সাঙ্কোপাঙ্গার সাহস আছে সে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে।
বক্তৃতা দেবে: বস্তি সাফা করবে। ঘর পরিষ্কার করবে।
এ গলি সে গলি দিয়ে বস্তির প্যাঁচ ছাড়িয়ে সতু বস্থি বড় রাস্তার দিকে এগোতে থাকে।
'নোংরামি আর খারাপ জল, পচা ময়লা আর মাছি। বোকামি আর কুসংস্কার এসব থেকেই কলেরা হয়। এসব যদি তাড়াতে পারেন তবে কলেরাও তাড়াতে পারবেন। আর নেবেন ইন্‌জেকশন, কলেরার ইন্‌জেকশন। যদি বাঁচতে চান তবে ইন্‌জেকশন নিন.... ।'
পিছনে সাঙ্কোপাঙ্গা বক্তৃতা দিচ্ছে:
বস্তির ঘরে আর বারান্দায়, গলিতে আর উঠোনে, কলতলায় আর পায়খানার

দোরে—মানুষ আর গোরু, মোষ আর ছাগল সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে সাঙ্কোপাঞ্জার বক্তৃতা।

সতু বস্তি ঝিমোতে ঝিমোতে বেরিয়ে আসে। ঠিক বেরোয় না, পালায়। পিছনে সাঙ্কোপাঞ্জার বক্তৃতা আর পদে পদে কাপড়ের খুঁটে চানাওয়ালার পয়সার ঝনঝনানি —সতু বস্তিকে তাড়া করে নিয়ে যায়।

রামভরোসকা হাঁসি

হাতটা ধোয়া দরকার। শার্ট আর প্যান্ট হুটোই অবিশ্বি গিয়েছে। কিন্তু সে তো ধোপাবাড়ির ব্যাপার। তবে হাতটা—হাতটা একটু ধোয়া দরকার। প্রায় কনুই অবধি রক্তের ছিটে লেগেছে। মুখে মুখ লাগিয়ে বাচ্চাটাকে ফুঁ দিতে ইচ্ছে করছিল না। এই সব বস্তির বাচ্চা, এদের জন্মগত সিফিলিস থাকতেই পারে। আর ঠোঁটে যদি একটা ঘা হয়? স্ত্যাঙ্কার? কিন্তু বাচ্চাটা যে নিশ্বাসই নিতে চাইছিল না। মায়ের পেট থেকে হয়ে অবধি—পাছায় চড়, ঠাণ্ডা জল, গরম জল, নল দিয়ে চোষা, কিছুতেই কিছু হয় না; শেষ পর্যন্ত ফুঁ দিতে বাচ্চাটা চেঁচাল—ট্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ....

নাঃ, মাথাটায় যে একটু হাত বোলাবে তাও তো হাতটা না ধুলে হবে না। এমন নীচু ঘরটা—বেরোতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল। তবে হ্যাঁ, বাচ্চাটা হয়েছে বেড়ে। ঠিক যেন একটি মাখনের টুকরো। মা-টা—এমন লক্ষ্মীছাড়ী যে একবার ভালো করে চেয়েও দেখল না। যত লজ্জা কি ডাক্তারকে? নাঃ এ শালা খোট্টাদের যদি কোন আক্কেল থাকে!

চৌকাঠের ওপারেই দাঁড়িয়ে আছে রামপদারথ। একেবারে সত্ত বাবা হয়েছে। চেঁচানি শুনেছে নিশ্চয়ই। জল আর সাবান চাইতেই এগিয়ে দেয়। জল অবিশ্বি গঙ্গার জল। ফিল্টার করা নাই বা হল, পবিত্র তো। কিন্তু এটা কি সাবান? হাতের চামড়া উঠে যাবার জোগাড়। তবে গামছাও এগিয়ে দেয়। ওই গামছায় হাত মুছলেই সতু বক্সির হয়েছে। পুরো ব্যাক্টিরিয়লজির বইটাই হাতে ঢুকে যাবে।

সতু বক্সি রুমাল দিয়ে হাত মুছবার সময় রামপদারথ-এর সাহস হয়। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে—লড়কা, না লড়কী? সতু বক্সি পকেটে হাত দেয়। গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটটা বেরিয়ে আসে। বাঁ-হাতে বুড়ো আঙ্গুলের নখে ভালো করে ঠুকে নিয়ে আল্‌গোছে হুটো ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরে—কাঠিটা দেশলাইয়ে ঘষতে ঘষতে বলে—লড়কা। দেশলাইটা জ্বলে ওঠে—সিগারেটও। আস্তে মাথা তুলে সতু বক্সি টান দেয় সিগারেটে। এক মুখ ধোঁয়া নিয়ে

মুখ তুলে তাকায়। দেশলাইয়ের আগুনটা হাতে। চালের খড় উপরে আবছামত দেখা যায়। বাঁশের খুঁটি পিছনে, আর তারও পিছনে রামখিলাওনের ভঁইস। দেশলাইয়ের গোলের আলোর ভিতরে রামপদারতের মুখ যেন পটের কেষ্টঠাকুরের মথার চারপাশের আলোর চক্কর। দুটো ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে গেছে। চোখ দুটো হয়ে গিয়েছে আরও ছোট। ঠোঁট দুটো দু-পাশে লম্বা হয়ে এসেছে।

রামপদারৎ হাসছে, ওর লড়কা হয়েছে।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সতু বদ্যি বলে 'আঃ....'

সেই দু-বছর আগে রামপদারতের লড়কা হয়েছিল? সেই বর্ষার রাতে ডিবরী জ্বালিয়ে বস্তির ভিতরে প্রসব করাতে হয়েছিল? সেই লড়কা রামভরোসের নিউমোনিয়া। কাল বিকেলে দেখতে এসেই সতু বদ্যি বুঝতে পেরেছিল। ঠোঁটটা নীল হয়েছে—নাকটা নিশ্বাসের সঙ্গে উঠছে নামছে। নাড়ীর গতি মিনিটে ১১০ অথচ নিশ্বাসের গতি ৪০। আর বুকে স্টেথো দিয়ে তো কথাই নেই। সেই চুল ঘষার মত কড় কড় আওয়াজ। প্রশ্বাসের চাইতে নিশ্বাসের আওয়াজ দীর্ঘস্থায়ী। সতু বদ্যির বুঝতে অসুবিধা হয় না।

চার লাখ পেনিসিলিন আর ঘুমের ওষুধ।

সকালবেলা এসেছে রামপদারৎ। ছেলে ঘুমুচ্ছে, কিছুতেই জাগছে না। সতু বদ্যিকে ছুটতে ছুটতেই আসতে হয়। নাঃ, নাক তো নড়ে না। নিশ্বাস তো বেশ আরামেই নিচ্ছে মনে হয়। নাড়ী? নাড়ীও ঠিক চলছে। তবে? রোগী ভালোই আছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসে সতু বদ্যির।

আসল রাষ্ট্রভাষায় জিজ্ঞাসা করতে হয়—দিমাগমে কীড়া আছে নাকি?

ঘাবড়ে যায় রামপদারৎ। জিজ্ঞেস করে তার বউ—'কাঁহে'....

রোগী যে ভালো আছে তা বুঝিয়ে দিতে হয় সতু বদ্যির। নিদ্রা যে প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার তা-ও।

তবুও জিজ্ঞেস করে রামভরোসের মা, জিন্দিগীর খত্‌রা কি নেই?

'না বাবা না' বিরক্ত হয়ে ধমকে মাথা তুলে তাকায় সতু বদ্যি। রামভরোসের মায়ের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকায়। দু-বছরে লজ্জা অনেক কমেছে তার। আর একবার ধমকাতে গিয়ে চমকে ওঠে। মায়ের কপালের ভাঁজটা মিলিয়ে গিয়েছে। মুখের দু-কোণে কিরকম ভাঁজ পড়েছে।

সামনের দুটো দাঁত একটু বেরিয়ে এসেছে। রামভরোসের মা হাসছে।
রামভরোসের জিন্দিগীর কোন খত্‌রা নেই কিনা তাই।
সতু বক্সির বিরক্তি মিলিয়ে যায়।
মুখে ভেসে ওঠে প্রশান্ত তৃপ্তি।

আবার কী হল! ডাক্তার জিজ্ঞেস করে রামপদারৎকে।
সেই রামভরোস? যাকে সাত সাল আগে দুনিয়াতে আমদানী করেছিল সতু বক্সি? সেই যাকে এক সাল আগে কেঁপরার অসুখ থেকে বাঁচিয়েছে? জিন্দিগী বাপিস্ করে দিয়েছে? সেই রামভরোস আবার এসেছে।
কেন?
ছেলে কি রকম পিলা হয়ে গিয়েছে। আখ পিলা—পিসাব ভি পিলা। কেবল টাট্টি সাদা। শুধু কি তাই? খেতেই চায় না, খেলেই বমি করে।
অসুখ বুঝতে দেরি হয় না সতু বক্সির। হাজার হোক জাত বক্সি তো! লক্ষণেই প্রকাশ আর তাছাড়া লিভারটা বেড়েছে। সুতরাং? ইন্‌ফেকটিভ হেপাটাইটিস্। অর্থাৎ কিনা বীজাণুঘটিত যকৃৎপ্রদাহ।
চিকিৎসা খুব সোজা। টেরামাইসিন খাওয়াও। আর তাছাড়া শালারা ছাতুখোর তো। মাছ মাংস খায় না। সুতরাং মিথিওনিন আর কোলিন দিতে হবে বাইরে থেকে। জান্তব প্রোটিন খেলে সেগুলো পেটের ভিতরে হজম হয়ে তার ভিতর থেকে এগুলো রক্তে মেশে, আর রক্ত দিয়ে লিভারে গিয়ে লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। কিন্তু জান্তব খাবার? এক মায়ের দুধ ছাড়া ওদের পেটে কখনও পড়ে না। তবে হ্যাঁ, চুহা উয়া (ইঁদুর) কেউ কেউ খায় বটে, তবে তারা ছোট জাত, তাদের জল চলে না। যাই হোক প্রেসক্রিপশান ঠিক হয়ে যায়।
কিন্তু আবার ফ্যাচাং। সবসুদ্ধ দাম হল যে শয়ের কোঠায়। রামপদারৎ-এর রোজগার তো মাহিনামে একষঠ রুপেয়া। তাহলে?
কেন? সতু বক্সির ঠাকুর্দা যখন মেডিকাল কলেজ থেকে পাশ করেছিল তখন তো চিকিৎসা ছিল ম্যাগসাল্‌ফ্। না না রাজা রামচন্দ্রের আমলে নয়। ১৮৮০ সালে। ম্যাগসাল্‌ফ্ পেটে গিয়ে জল টানবে। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে টানবে, বৃহদান্ত্র থেকে টানবে। যকৃৎ থেকে টানবে, প্লীহা থেকে টানবে।

সুতরাং যকৃৎ থেকে বিষও নামিয়ে নিয়ে আসবে। আর নামিয়ে এনে সোজা ফেলে দেবে পায়খানায়।

সবটা নামাতে পারবে না ?

বীজাণু না মেরে তার বিষ নামিয়ে আর কতটুকু লাভ হবে ?

যোল আনা না হলেও এক আনা তো হবে ?

আর লিভারের স্বাস্থ্য ভালো করা ?

কেন ? মিথিওনিন কোলিন না পেলেও গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দাও খরচা কম হবে।

ইন্‌জেকশনেও খরচা ? তাহলে গ্লুকোজ খেতে দাও। গ্লুকোজের দাম খেতে দিলেও বেশী পড়বে ?

চিনি খাক তাহলে। ভাত খাক। এসবই তো যৌগিক শর্করা। এগুলো ভেঙে পেটের ভিতরে গ্লুকোজই তো তৈরি হয়। তারপর রক্তে যাবে আর তাহলেই লিভারে পৌঁছে যাবে।

মধু অভাবে কি আর গুড় চলে না ?

খোদ রামজীর পূজোয় চলে আর এ তো রামভরোস্।

দমবার পাত্র সতু বস্থি নয়। আসল জাত বস্থি। সুতরাং বুঝিয়ে দেওয়া গেল। রোজ একদাগ করে ম্যাগসাল্‌ফ্ মিকশ্চার খাবে। আর পথ্যি হল প্রচুর ভাত আর চিনি। মানে শর্করা হলেই হল, তাহলেই গ্লুকোজ হয়ে রক্তে যাবে আর গ্লাইকোজেন হয়ে লিভারে ঢুকবে।

হ্যাঁ বুঝলে ? সতু বস্থি বোঝায় রামপদারৎকে। দাওয়া এক খোরাক রোজ —আর রোজানা পৌয়া-ভর চিনি ইয়ে শক্কর। রামপদারৎ বুঝে ফেলে, চলে যায় দাওয়াই বানানোর ঘরে। রামভরোস্‌ও। সতু বস্থি ডাকে অন্য রোগীকে।

সতু বস্থির হঠাৎ নজর পড়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে রামভরোসের দিকে। সে হাসছে মাঝে মাঝে ফিক্ ফিক্ করে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সতু বস্থির দিকে আর মাঝে মাঝে রামপদারৎএর দিকে।

সতু বস্থি ঘাবড়ে যায়, ছোঁড়া হাসে কেন ? সতু বস্থির—দু-মন দশ সের ওজনের পিপের মত চেহারা দেখে ?

না তা নয়।

তাহলে কি ও টেরামাইসিনের বদলে ম্যাগসাল্‌ফ-এর ব্যাপার টের পেয়েছে ?

না তা নয়।

তাহলে ? ও মিথিওনিন আর কোলিন-এর বদলে—চিনি, গুড় আর ভাত-এর খবর নিশ্চয়ই টের পেয়েছে। ব্যাটা খোট্টা হলে কি হয় ভোজপুরী তো আরা জেলায় বাড়ি—ভারী ফিচেল।

হঠাৎ সতু বক্সি শুনতে পায়। রামভরোস্ বলছে। রামপদারৎকে বলছে। ভয়ংকর খুশি হয়ে বলছে। —পৌয়াভর চিনি ? রোজানা ? বাবুজী ? আর হাসছে ফিক্ ফিক্, এ তো নির্মল খুশির হাসি।

একটা পর্দা উঠে যায় সতু বক্সির চোখের উপর থেকে।

ভোজপুরী কুলি। নুন-লঙ্কা, ছাতুই এদের খাদ্য। ভাত-রুটি তো বিলাসিতা আর তাছাড়া রোজ রোজ চিনি ? এক পোয়া করে। এ তো রাজভোগ। রামভরোস্ হেসেই চলে।

সতু বক্সি তাকিয়ে থাকে, সতু বক্সির গলা দিয়ে কি যেন একটা ঠেলে ওঠে। মনে হয় ওকে চারদিক থেকে যেন চাবুক মারছে। ওর মাথন জিনের প্যাণ্ট আর বিলিতি পপলিনের শার্ট; ওর পার্কার-৫১ কলম আর সোনার ঘড়ি; ওর রিভলভিং চেয়ার আর সেক্রেটারিয়েট টেবিল।

মায় কবিরাজী বংশপরিচয় আর এম-বি ডিগ্রী সব একসঙ্গে চাবুক মারছে। সতু বক্সি তাকিয়ে থাকে রাস্তায়। রামভরোসের দিকে তাকাতেই পারে না। মনে হয় হিপোক্রেটিস থেকে শুরু করে সতু বক্সির বাপ-ঠাকুর্দা পর্যন্ত, চরকশুশ্রুত থেকে সতু বক্সির কবিরাজ প্রপিতামহ পর্যন্ত সবাই যেন একসঙ্গে হাসছে। সতু বক্সির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। দাঁত ভেংচে হাসছে।

রামভরোস হাসে আর হাসে।

রোজ কেয়ামত

বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বৃদ্ধ হয়েছেন। বয়স সত্তরের উপর হবে। তার বাড়িতে সতু বস্থির প্রায়ই আসতে হয়।

ভদ্রলোকের অসুখটার নামের বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ জরাজনিত মানসিক ও শারীরিক জড়তা।

ভদ্রলোকের মানসিক বুদ্ধিঘটিত সমস্ত বৃত্তিগুলো ক্রমশ লোপ পেয়ে চলেছে। পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে শালীনতা বোধ চলে গিয়েছে—সবসন আর দিগ্‌বসনের তফাৎ তিনি আর বোঝেন না। মলমূত্র সম্বন্ধে ঘৃণাবোধ তাঁর আর নেই। সুতরাং শয়নকক্ষ আর মলমূত্র ত্যাগের কক্ষ—এ দুয়ের ভেদাভেদ তাঁর কাছে লুপ্ত। সোজাসুজি বলতে গেলে, ভদ্রলোক আর একটি নির্বোধ জন্তুর ভিতরে বিশেষ কোন তফাৎ এখন আর নেই।

অথচ ভদ্রলোক চিরকাল এ রকম ছিলেন না। এক সময় কলকাতা শহরের ব্যবসায়ী মহল তাঁকে বেশ ভালভাবেই চিনত। আর তাঁর পরিচয় শুধু অর্থেই ছিল না—ক্ষুরধার বুদ্ধিই ছিল তাঁর বিশেষ পরিচয়। যখন তিনি মালপত্রের বাঁধাই কারবার করতেন, তখন কোন্ মালের দর কতটা উঠবে নামবে তা যেন তাঁর নখদর্পণে লেখা থাকত। আচ্ছা আচ্ছা মাড়োয়ারীরা পর্যন্ত বলত, বাবু যেন যাদু জানে।

তাছাড়া ধরুন না—প্রথম যুদ্ধের আগে ভদ্রলোক ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ—একেবারেই সাধারণ গৃহস্থ; অথচ যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন তাঁর ব্যবসার পরিধি বিরাট হয়ে উঠেছে।

আজকে অর্থহীন চিৎকারে পাড়া মাতিয়ে তুলছে এই যে জড় মাংসপিণ্ড, তাকে দেখলে ৪০।৫০ বছর আগেকার সুপুরুষ ভদ্রলোক বলে কল্পনা করাই শক্ত। তাঁর তখনকার কথাবার্তা, চালচলন কত লোককে যে চমৎকৃত করেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

ব্যবসায়ী মহলে যাঁরা ঘোরাফেরা করেন, তাঁরা জানেন ব্যবসায়ীদের মিত্র যেমন থাকে, শত্রুও তেমনি থাকে।

এ ভদ্রলোকেরও তা ছিল।

কিন্তু তার চেয়েও ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব।

যে কোম্পানি হয়তো সত্যিই ডুবে যাবে—যার শেয়ার কেউই কিনতে চাইবে না, সে কোম্পানির শেয়ারও হয়তো উনি বাজারে বেরোলে ঠিকই গছিয়ে আসতে পারবেন।

আবার সেই কোম্পানি যখন সত্যিই লিকুইডেশনে যেত, তখন তার সঙ্গে যুক্ত সবাই সমাজে অভিযুক্ত হলেও উনি কখনো অভিযুক্ত হতেন না।

এমন কি, লাভের মোটা অংশ ওঁরই পকেটে যাওয়া সত্বেও না।

এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন উনি।

আর আজ?

একটা নোংরা ছেঁড়া বিছানায় মেঝেতে শুয়ে উনি মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠেন। অদ্ভুত জন্তুর মত বিকট চিৎকার।

বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করলে বিছানা নোংরা হবেই, নখ দিয়ে অনবরত টানাটানি করলে বিছানা ছিঁড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আর গড়িয়ে খাট থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে তাঁকে মেঝেতে বিছানা করে দেওয়াও অন্যায় নয়।

তবে চিৎকার?

শব্দবদ্ধ বাক্য মুখ দিয়ে প্রকাশ করার ক্ষমতা ভদ্রলোকের লোপ পেয়েছে মানে তাঁর মস্তিষ্কের লোপ পেয়েছে। অথচ হয়তো ভদ্রলোকের কোন অসুবিধা হয়—ভেজা বিছানায় হয়তো শীত লাগে, নোংরা বিছানায় হয়তো পোকা কামড়ায়—ভদ্রলোক চিৎকার করেন, জন্তুর মত বিকট তীব্র চিৎকার।

এ-সবের কারণ?

মস্তিষ্ক জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সতু বদ্যি রোজই দেখে আর উপলব্ধি করে। সত্যিই মৃত্যুর চাইতেও জরা বেশী ভয়াবহ।

কিন্তু এই যদি রোগী হয় তা হলে সতু বদ্যিই বা কি করবে?

সতু বদ্যি অনেক কিছু করতে পারে।

ভদ্রলোক যদি দিনরাত্রির ভিতরে অধিকাংশ সময়ই ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন তা হলে তাঁর জন্তুসুলভ অত্যাচার পরিমাণে কমতে পারে।

এ সম্বন্ধে সতু বদ্যি সাহায্য করতে পারে।

সর্বাঙ্গে ঘা (বেড সোর) হয়েছে তা থেকে তীব্র পচা গন্ধে নীচতলার ফ্ল্যাটে

মনুষ্য বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে—সেই গন্ধ হয়তো সতু বখি কমাতে পারে। আর তাছাড়া আছেন ভদ্রলোকের ছেলে তিনিও ব্যবসায়ী। ভদ্রলোকের উপযুক্ত সন্তান। তাঁর অর্থ আছে, তাঁর অসুস্থ বাবাকে দেখতে দৈনিক একজন ডাক্তার বাড়িতে আসা প্রয়োজন। আর সে ডাক্তারের যদি পাড়ায় প্রতিষ্ঠা থাকে সতু বখির মত—তাহলে তো ভালোই।

ডাক্তারের শুধু রোগ নিরাময় করাই একমাত্র কাজ নয়—তার আলংকারিক মূল্যও অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর।

আর তাছাড়া ভদ্রলোক তার বাবার জন্যে বন্দোবস্তের কোন ত্রুটি রাখেননি। একতলার ফ্ল্যাটটা সম্পূর্ণ তাঁর বাবারই প্রয়োজনে লাগে। তাছাড়া ঝি আছে, চাকর আছে, জমাদার আছে, রোগীর স্ত্রী অর্থাৎ ভদ্রলোকের মা দেখাশোনা করেন তিনিও আছেন।

আর সর্বোপরি আছে সতু বখি। আর তার নির্দেশপত্র অনুসারে ওষুধ।

সতু বখি এ ফ্ল্যাটে প্রায় রোজই আসে।

আর এ ফ্ল্যাটের একতলায় এলেই চোখ সত্যিই জুড়িয়ে যায়। এই ফ্ল্যাটে যে এ রকম একজন রোগী থাকেন—হঠাৎ হয়তো অনেকেই বুঝতে পারবেন না। অবাক হয়ে যায় সতু বখি। আর শুধু সতু বখিই বা কেন—যে কোন লোকই অবাক হবে ঝকঝকে তকতকে এই ফ্ল্যাট দেখে।

অথচ অবাক হবার কিই বা আছে।

মানুষ কিনা পারে আর কি না জানে। অডিকোলন দিলে দুর্গন্ধ দূর হয় সে কি আর কারো অজানা? যত পূতি গন্ধই হোক রোগীকে দেখাশোনা করলে চেষ্টা করলে যে পরিষ্কার রাখা যায় তাই বা কার অজানা?

অথচ কত কম বাড়িতে সতু বখি এই জ্ঞানের বাস্তব পরিচয় পায়।

অবিশ্যি সতু বখি জানে এভাবে ভদ্রলোককে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, জরা হল মৃত্যুর অগ্রদূত। তা ছাড়া ভদ্রলোকের আছে বহুমূত্র রোগ। সুতরাং যে কোনদিন ভদ্রলোক মারা যেতে পারেন।

তাইতে যেদিন ও ফ্ল্যাটের চাকর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল সতু বখিকে ডাকতে—সেদিন দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে হাজির হয়ে সতু বখির শঙ্কিত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

ভদ্রলোক কাঁপছিলেন হি হি করে—ভীষণ কাঁপছিলেন। আর যন্ত্রণাকাতর পশুর মত তীব্র চিৎকার করছিলেন। বোধগম্য কিছু বলার ক্ষমতা তো

অনেকদিনই লোপ পেয়েছে—সুতরাং কি হয়েছে বাড়ির লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

কিন্তু সতু বদ্যি বুঝতে পারে।

ভদ্রলোক কাঁপছিলেন। কাঁপুনিটা জ্বর আসবার পূর্ব লক্ষণ। আর কাঁপিয়ে যখন জ্বর আসছে তখন কোন বীজাণুঘটিত রোগের সংক্রমণ হয়েছে বলেই মনে হয়।

কী বীজাণু? ম্যালেরিয়া? না, এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া বড় একটা হয় না। পুঁজসৃষ্টিকারী কোন বীজাণু? হতে পারে, বিছানার ঘা আর বহুমূত্র দুইই যখন আছে তখন অসম্ভব নিশ্চয়ই নয়।

নিউমোনিয়া? তাও হতে পারে। চিত হয়ে এক ভাবেই প্রায় শুয়ে থাকেন এই বয়সে সুতরাং, তাও হতে পারে। তবে স্টেথোস্কোপে কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সব সময় তো পাওয়াও যায় না।

চিকিৎসা?

ত্রুটিহীন সেবার কথা বলাই এখানে বাহুল্য। মাইনে করা দুজন লোক দেখা শোনা করছে দিনরাত। তবুও তাদের বুঝিয়ে দিতে হয়ঃ ১০৩-এর উপর জ্বর উঠলে মাথায় জল দিতে হবে কিংবা ধরুন বিছানার ঘায়ের যত্ন নিতে হবে—রবারে হাওয়া ভর্তি নরম বালিশ দিয়ে আধশোয়া করে শুইয়ে রাখতে হবে।

আর তাছাড়া ওষুধ। প্রধানতঃ, টেট্রাসাইক্লিন-এর উপরই সতু বদ্যি এসব ক্ষেত্রে আস্থা রাখে। কারণ অনেক রকম অনেক জাতের বীজাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে—টেট্রাসাইক্লিন সমর্থ। যেখানে ঠিক কি ধরনের বীজাণু আক্রমণ করেছে তা বোঝা যাচ্ছে না—সেখানে আন্দাজে ঢিল মারতে হলে টেট্রাসাইক্লিনের মত ঢিল আর নেই।

চিকিৎসা ছাড়াও এখানে অন্য কর্তব্য বাকি থেকে যায়। এই রোগীর যদি এই ধরনের জ্বর হয়—তা হলে জীবনের আশঙ্কা যথেষ্টই। সুতরাং রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার রোগের গুরুত্ব। তা সতু বদ্যি দেয়। তারপর শুরু হয় ঘটা করে চিকিৎসা। সতু বদ্যি আসে, ওষুধ আসে, নার্স আসে, পথ্য আসে।

আর শুধু কি তাই? আত্মীয় স্বজন সবাই এসে বাড়িতে ভিড় করেন। মেয়ে আসেন, জামাই আসেন। ছেলে আসেন, বউ আসেন।

আর তাইতেই শেষ নয়। মাথার কাছে টবে তুলসী গাছ আসে—আর পায়ের কাছে আসে রজনীগন্ধার ঝাড়। বুকে রাখা হয় পকেট গীতা আর গায়ে দেয়া হয় নামাবলীর চাদর। মাথার বালিশের নীচে রাখা হয় বড় গীতা আর মুখে দেয়া হয় গঙ্গাজল।

ধূপের গন্ধে আর গীতা পাঠে বাড়ি গম গম করে।

সত্যিই পুত্র-ভাগ্য ভদ্রলোকের আছে। ছেলে জানেন যে বাবা বাঁচবেন না। কিন্তু অর্থ ব্যয় করেন অকাতরে। সতু বদ্যির টেট্রাসাইক্লিন ইন্‌জেক্‌শন আর ওষুধের দাম আর ভিজিট নিয়ে যদি সতেরো টাকা পাওনা হয় তা হলে তুখানা দশ টাকার নোটই দিয়ে দেন, ফেরত টাকার জন্যে ভ্রুক্ষেপও করেন না।

কিন্তু রোগ সতু বদ্যিকে গ্রাহ্যও করে না। হয়তো প্রথম দিনে সতু বদ্যি টেট্রাসাইক্লিন খেতে দেয়—পরদিন দেয় মাংসপেশীর ভিতরে ইন্‌জেক্‌শন। পরদিন হয়তো দেয়—শিরার ভিতরে ইন্‌জেক্‌শন। গ্লুকোজ দেয়, ভিটামিন দেয়। গোটা চিকিৎসা-শাস্ত্রই গুলে খাইয়ে দেয়া হয় যেন।

কিন্তু রোগের গতি অমোঘ, চতুর্থ দিন সকাল আটটার সময় সতু বদ্যি ডাকে ছেলেকে। তাকে বলে দেয় রোগের গুরুত্ব আর একবার। যে কোন সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হতে পারে। এমন কি তু-এক ঘণ্টার ভিতরেই, যদি হয় তা হলে সতু বদ্যিকে খবর দিতে।

সবাই গম্ভীর মুখে শোনেন। সবাই তারিফ করেন সতু বদ্যিকে। সত্যিই সতু বদ্যি যে খেটেছে রোগীর জন্যে তার তুলনা নেই। পয়সায় তার দাম মেলে না।

চার টাকার জায়গায় দশ টাকা পকেটে নিয়ে সতু বদ্যি বাড়ি ফেরে।

কিন্তু ডেথ্ সার্টিফিকেট লেখার ডাক আর সতু বদ্যির আসে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়। সকাল গড়িয়ে তুপুর হয়—তুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। রাতও হয়—আবার সকালও হয় কিন্তু ভদ্রলোক খবর আর দেন না।

শেষে পরদিন সকাল আটটায় আবার সতু বদ্যি যায়—বৃদ্ধের ফ্ল্যাটে। অনাহূতই যায়।

রোগী পরীক্ষা করে।

নাঃ, মৃত্যুর লক্ষণ নেই। শুধু তাই নয় জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। সব দিকেই উন্নতি হয়েছে। আপাতত বিপদ কেটে গিয়েছে।

খুশি হয়ে ওঠে সতু বত্তি। সত্যিই তার ওষুধ কথা বলে। ডাকলে ডাক শোনে। আর তা ছাড়া সতু বত্তি জাত বত্তি—মধুসূদন কবিরাজ চন্দ্রশেখর কবিরাজের বংশধর। অত সহজে হার মেনে পালিয়ে যাবার পাত্র সে নয়।

উপরতলায় ছেলের ফ্ল্যাটে আজ আবার ডাক পড়ে।

খুব হাসেন ভদ্রলোক, 'কি ডাক্তারবাবু, হেরে গেলেন তো বাবার কাছে?'

হ্যাঁ, হেরে সতু বত্তি গিয়েছে। তা সতু বত্তি স্বীকার করে। সতু বত্তির ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

তবে—'প্রিয় তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো মোর জয়।'

বিপদে পড়ে গুরুদেবকে স্মরণ করে সতু বত্তি।

কিন্তু ভদ্রলোক শুধু হারই মানেননি। আর্থিক লোকসানও তার যথেষ্ট হয়েছে। তিনি ট্যাক্শি পাঠিয়ে লোকজন আনিয়েছিলেন—তাদের আবার ফেরত পাঠাতে হয়েছে ট্যাক্শি করেই। কীর্তনের দল আনিয়েছিলেন—তাদের গুণাগার দিতে হয়েছে। ফটোগ্রাফার আনিয়েছিলেন—তাতে লোকসান হয়েছে।

তবে তাতে সতু বত্তি অপ্রতিভ হয়নি। রোগ তো কমেছে। আর অর্থ বয়্য? এ হল ব্যায়রাম—মানে ব্যয় করলে আরাম।

ভদ্রলোক তবুও কথা বলেন, সতু বত্তিকে প্রকারান্তরে বোকা বলেন—অজ্ঞ বলেন।

আস্তে আস্তে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় সতু বত্তির চোখে।

পিতার মৃত্যু না হওয়াতে ভদ্রলোক খুশি হননি বললে কম বলা হয়—বরং বিরক্তই হয়েছেন। পশুর মত চিৎকার করে—একটা জড় মাংসপিণ্ড তার উপর কোন মমতা নেই ছেলের—আছে শুধু তীব্র বিরক্তি আর ঘৃণা।

তবে ভদ্রলোকের নিজের সামাজিক সম্মান আছে। আর এতদিনের—নার্স আর ডাক্তার, ওষুধ আর পথ্য, তুলসী আর গীতা—সবই সেই সম্মানের পরিচয়।

'যেমন আপনি তেমন আপনার শাস্ত্র........।' অবজ্ঞার হাসি হাসেন ভদ্রলোক। আর সায় দেন ভগ্নীপতিরা-বন্ধুরা।

অপমানিত বোধ করে সতু বত্তি। তবুও অমায়িক হাসি হাসে। তারপর গল্প শুরু করে হাসি মুখে:

চীনদেশে একজন ডাক্তার ছিলেন। বয়স্ক-প্রাচীন ডাক্তার। তাঁকে একবার

এক জমিদারের বাড়ি ডেকে নিয়ে গেল। জমিদারের ছেলের অসুখ। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করলেন—কিন্তু ছেলে বাঁচল না। চীনের জমিদার জানেন তো, ওরা সব বিষয়েই তাদের এলাকার ভিতরে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ছেলের মৃত্যুতে জমিদার গেলেন ভীষণ রেগে। তার লোকজনদের হুকুম দিলেন 'বেঁধে রাখ ডাক্তারকে গারদে। ছেলের সঙ্গে ওরও সৎকার করব।'

তারা নিয়ে বেঁধে রাখল ডাক্তারকে গারদে। ডাক্তার সারাদিন চেষ্টা করে হাত-পায়ের দড়ি খুলে নিলেন। তারপর সন্ধ্যাবেলা থেকে দেখতে লাগলেন পালাবার কোন রাস্তা আছে কিনা। শেষে দেখলেন তিন দিকে কোন রাস্তাই নেই। চতুর্থ দিকে অনেক উঁচু একটা জানলা আছে, সেই জানলা টপকে লাফিয়ে অবিশ্যি পড়া যায়। কিন্তু তাহলে গিয়ে পড়তে হবে নদীতে। কিন্তু উপায়ই বা কি? প্রাণের দায়। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার যা থাকে কুল কপালে বলে লাফ দিয়ে নদীতে পড়ে সাঁতরে গিয়ে পৌছলেন বাড়িতে।

বাড়ি যখন পৌঁছলেন তখন মাঝ রাত। কেউই জেগে নেই, কেবল ছেলে রাত জেগে লেখাপড়া করছে। ছেলে ডাক্তারী পড়ে। তাকে জেগে থাকতে দেখে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন 'কি? ডাক্তারী পড়া পড়ছ?'

'হ্যাঁ বাবা,' ছেলে উত্তর দিল।

'পড়ছ পড়ো।' বাবা গম্ভীরভাবে উপদেশ দিলেন 'কিন্তু সাঁতারটাও শিখো। ডাক্তারী করতে হলে ওটাও দরকার।'

গল্প শুনে ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। ঘরের আবহাওয়াটাও একটু হালকা হল। কিন্তু সতু বিদ্যির গল্প তখনও শেষ হয়নি। হাসি থামলে সতু বিদ্যি আবার বলা শুরু করল, 'রোগী মরে গেলে অনেক সময় ডাক্তারকে সাঁতার শিখতে হয়—এ আমি শুনেছি কিন্তু রোগী বেঁচে থাকলেও যে সাঁতার শিখতে হতে পারে এ আমি কখনও শুনিনি।'

ঘরের হালকা আবহাওয়াটা আবার ভারী হয়ে ওঠে। পুত্রের মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে সতু বিদ্যি সিঁড়িতে। ফি না নিয়েই।

আর তারপর থেকেই শুধু বাঁ দিককার ফ্ল্যাটটাই নয়, পুরো বাড়িটা সম্পর্কেই সতু বিদ্যির মন বিষিয়ে ছিল। সত্যিই মানুষকে জানা ব্রহ্মকে জানার চাইতেও শক্ত। সতু বিদ্যিকে লোকে ডাকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে।

বাঁচাতে হয়তো সর্বক্ষেত্রে সতু বিদ্যি পারে না—তবে চেষ্টা করে। আর চেষ্টার জন্যে মজুরি পায়। দুষ্টু লোকে মানুষ মারার জন্যেও অনেক সময় ডাক্তার

ডাকে কিন্তু অন্ততপক্ষে সতু বত্মিকে ডাকে না। তবে এ রকম যে ডাকে তা সতু বত্মি জানে। এ দুটো ছাড়া যে অন্য রকম মতলবেও লোকে ডাক্তার ডাকতে পারে তা সতু বত্মির মাথায়ই কখনো আসেনি।

আর সে মতলবটা কি? না সতু বত্মিকে ব্যবহার করা অলংকার হিসাবে। আর কী অলংকার? কালো মোটা—দু-মন দশ সের পিপের মত চেহারা—সে কিনা অলংকার? ছোঃ।

তাইতে যখন ডানদিকের ফ্ল্যাটে ডাক পড়ল তখন সতু বত্মি খুশি হয়নি, মোটেই খুশি হয়নি। গোটা বাড়িটার উপরেই সতু বত্মির মন বিষিয়ে ছিল।

প্রতিবারেই সতু বত্মি এসেছে বাঁ দিকের ফ্ল্যাটে। দুটো তলায় দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে ভদ্রলোকেরা থাকেন। আধুনিক যুগে অর্থে যত রকম আরামের উপকরণ ক্রয় করা সম্ভব সবই তাঁদের আছে—জিনিস গরম করার ইলেকট্রিক রেঞ্জ আছে—ঠাণ্ডা করার রেফ্রিজারেটর আছে। গরমকালের পাখা আছে, শীতকালে গরম হবার জন্যে বৈদ্যুতিক তাপের বন্দোবস্ত আছে, ভালো বসবার ঘর আছে, শোবার ঘর আছে, খাবার ঘর আছে—স্নান-ঘর আছে। ফ্ল্যাটটায় ঢুকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। হ্যাঁ, বাঁচতে হলে এমনি করেই বাঁচতে হয়। মাতা বসুমতীর যত রূপ-রস-গন্ধ সব তো তার সন্তানদের জন্যেই—আর তার সন্তান বলতে মানুষ। সুতরাং, সেই রূপ-রস-গন্ধ ভালো করেই ভোগ করা উচিত।

আর এ ফ্ল্যাটটি?

দারিদ্র্য যেন দাঁত বার করে ভ্যাংচাচ্ছে। ঢুকেই বারান্দায় প্রথম চোখে পড়ে সারি সারি আধ-ময়লা ছেঁড়া পুরনো কাপড় জামা ঝুলছে দড়ি থেকে, তারপর দরজা—তাতেও পর্দা নেই, জানলার পর্দাগুলো যেমন নোংরা তেমনি ছেঁড়া শাড়ী দিয়ে তৈরি, পর্দা ঝোলানোর স্প্রিংও নেই, পুরনো কাপড়ের পাড় দিয়ে কোন রকমে ঝোলানো হয়েছে।

আর সব চাইতে মজার ব্যাপার রুগী নিয়ে। বাঁদিকের ফ্ল্যাটেও এক বুড়ো রোগী আর ডানদিকের ফ্লাটেও এক বুড়ো রোগী।

তবে এ ভদ্রলোকের বয়স একটু কম। হয়তো বছর ষাটেক হবে। অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। নাড়ী প্রায় বোঝাই যায় না। নিশ্বাসের গতিও ক্ষীণ কিন্তু দ্রুত। আর শুকনো জিব ও গর্তে ঢোকা

চোখ—চামড়া ফুটো করে প্রায় বেরিয়ে আসা হাড়গুলো দেখে মনে হয় যেন শুধু যে কোন খাদ্যই শরীরের ভিতরে ঢোকেনি তাই নয়,—এমন কি জলও দেহে ঢোকেনি বহুদিন।

সতু বদ্যি রোগ নির্ণয় শুরু করে। ভদ্রলোকের অম্বলের অসুখ বহুদিন ছিল। বহুদিন মানে ধরুন ত্রিশ বছর। ভদ্রলোকের ছেলে ভোঁদড়-এর বয়সই তো বাইশ বছর হল—তারও প্রায় আট-দশ বছর আগে থেকে। তবে আগে ভদ্রলোক বেশ সুস্থ, সবল মানুষ ছিলেন।

জোয়ান বয়সে সত্যিকারের জোয়ানই ছিলেন। খেতে পারতেনও যেমন, খেতে ভালোও বাসতেন তেমন আর খেতেনও তেমনি।

'বুড়ো খেত বেশ। ধরুন চড়ুই পাখী ধরে ভেজেও খেয়েছে আবার ধাঙ্গড়-দের কাছে শুয়োরও এনে খেয়েছে। তবে গোরুটা খায়নি—যাই হোক বামুনের ছেলে তো।'

ভোঁদড় বলে হাসিমুখে। সতু বদ্যি বিরক্তই হয়। শুধু কথায়ই নয়—মৃত্যুপথযাত্রী বাবার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ওই রকম মৃদু মিষ্টি হাসি দেখেও সতু বদ্যি বিরক্ত হয়।—এ বাড়িটাই কি এমনি?

যাই হোক। তবে ভদ্রলোক অম্বলেও ভুগতেন মাঝে মাঝে। প্রথম প্রথম একটু সোডা-টোডা খেলেই অম্বলটা কমে যেত। কিন্তু ব্যথাটা ক্রমশই বেড়েছে।

মাঝে মাঝে হয়তো হাসপাতালে গিয়েছেন। সেখানে হয়তো সপ্তাহের পর সপ্তাহ দুধ আর ওষুধ খাইয়ে রেখেছে—ব্যথা সেরেছে—আবার ফিরে এসেছেন—আবার অনিয়ম করেছেন—আবার ব্যথা হয়েছে।

অনিয়মের জন্যে অবিশ্যি ভদ্রলোককে একেবারে ষোল আনা দোষীও করা যায় না। ছিলেন তো স্কুল মাস্টার। তাও প্রাইভেট স্কুলের। কলকাতা শহরে সংসার করেছেন। তিনটি ছেলে, একটি মেয়ে, স্ত্রী, দু-একজন আশ্রিত সব মিলিয়ে সংসারটিও খুব ছোট নয়। বাড়িভাড়া দিতে হয়েছে। সামাজিকতা করতে হয়েছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও শিখিয়েছেন। এক ছেলেকে ওভারসিয়ারী পড়িয়েছেন—আর এক ছেলেকেও ডাক্তারী পড়ানোর ইচ্ছে।

সুতরাং, সারা জীবন পরিশ্রমও করতে হয়েছে অমানুষিক। স্কুলে পড়িয়েছেন, বাইরে ছাত্র পড়িয়েছেন। বাসায় কোচিং ক্লাস করেছেন—পরীক্ষার খাতা

দেখেছেন, ভূতের মত খেটে যেখানেই দুটো পয়সা রোজগার করা যায় খাটতে সেখানে কোন কসুর করেননি। তাছাড়াও ছিল—দুনিয়ার নানান জিনিস নিয়ে লেখাপড়া করার বাতিক। সুতরাং ষাট বছর বয়সে বিশ্রাম পেয়েছেন কমই।

আর ছেলেগুলোর পিছনেই কি কম খেটেছেন? বলতেন—গরীব স্কুল-মাস্টার ওদের জন্যে তো কিছুই রেখে যেতে পারবেন না—অন্তত পক্ষে ওরা শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান হোক তার জন্যে উনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করবেন না। ছেলেদের নিজে পড়িয়েছেন। সময় পেলে তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন। তাদের নিয়ে বেড়িয়েছেন। তাদের সঙ্গে শারীরিক ব্যায়ামও করেছেন।

আর শেষ দিকটা মাস্টারী আর ছেলেমেয়ে ছাড়া ওঁর কিছুই ছিল না।

কথা বলতে বলতে রোগীর পুরো সংসারটাই প্রায় ওঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। সুস্থ, সমর্থ, নিষ্পাপ কয়েকটি নিম্নমধ্যবিত্ত ছেলেমেয়ে। বড়টি ওভারসিয়ার হয়েছে। মেজটি ম্যাট্রিক পাশ করে টাইপরাইটিং আর শর্টহ্যাণ্ড শিখছে। ছোটটি ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে আই, এস-সি, পড়ছে। ডাক্তারী পড়বে। আরও দাঁড়িয়ে বিনুনী-ঝোলানো স্কুলে পড়া মেয়ে আর শাঁখা আর নোয়া হাতে সিঁদুরের টিপ কপালে আর লালপাড় শাড়ী পরনে তাদের মা। এই নাকি ভদ্রলোকের সারা জীবনের সঞ্চয়।

বারো বছর মাস্টারী করলে নাকি গাধা হয় সে হিসাবে ভদ্রলোক তিনবার গাধা হয়েছেন। কারণ মাস্টারী ওঁর হয়ে গিয়েছে অন্তত ছত্রিশ বছর। আর তার সঞ্চয় এই।

সে যাই হোক এবারও ওঁর ব্যথা হয়েছিল তিন-চার মাস আগে। অন্যান্য বার ব্যথা হয় কিছুদিন থাকে আবার কমে যায় কিন্তু এবার আর কমছিল না। এমনি ঘরের চিকিৎসা তারপর সেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় দুধ আর ওষুধ খাওয়া চিকিৎসা কিছুতেই না। শেষে শুরু হল বমি। যা খেতেন কিছুই পেটে থাকত না শেষ পর্যন্ত। সবই বমির সঙ্গে উঠে আসত। প্রায় মাসখানেক বমি করবার পর এই হাল দাঁড়িয়েছে।

সারা জীবনই ভদ্রলোক ভুগছেন। সুতরাং চিকিৎসাও করিয়েছেন অনেক—ডাক্তার দেখিয়েছেন অনেক। এখন মৃত্যুর আগে পাড়ার লোক বলল সতু বদ্যি নাকি অসাধ্য সাধন করতে পারে—তাইতে তারা সতু বদ্যিরই শরণাপন্ন হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

সতু বদ্যি রোগী পরীক্ষা করে। বেশ ভালো করে পরীক্ষা করে। জিব পরীক্ষা করে। দাঁত পরীক্ষা করে। নাড়ীর গতি পরীক্ষা করে। নিশ্বাসের চরিত্র পরীক্ষা করে। রক্তের চাপ পরীক্ষা করে, হৃৎপিণ্ডের অবস্থা পরীক্ষা করে, বুক পরীক্ষা করে, পেট পরীক্ষা করে—অর্থাৎ কিনা মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সবই পরীক্ষা করে।

তারপরে চেয়ারে বসে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, ভদ্রলোকের সারা জীবনের সঞ্চয় ঠিকই আছে। মাথার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা।

চিকিৎসা শুরু করবার আগে সতু বদ্যি খোলাখুলি কথা বলে নিতে চায়। বাঁদিকের ফ্ল্যাটের সাঁতার শেখার অভিজ্ঞতা সতু বদ্যি এত তাড়াতাড়ি ভোলেনি, সুতরাং সতু বদ্যি বুঝিয়ে বলে। বিশদ করে বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে বলে :

পাকস্থলী থেকে নীচের দিকে খাদ্য পানীয় ইত্যাদি যাবার রাস্তা ভদ্রলোকের বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রায় মাসখানেক হল বন্ধ হয়েছে। তার ফলে গত একমাস ধরে উনি প্রায় নির্জলা উপোস করে আছেন। এখনকার লক্ষণ সব নির্জলা উপোসের। মৃত্যুমুখে যাবার লক্ষণ।

সুতরাং এখুনি যে মৃত্যু ওঁকে গ্রাস করবার চেষ্টা করছে তার সঙ্গে লড়তে হলে যে-কোন রকমে ওঁর দেহের পুষ্টিসাধন করতে হবে। আর তা করবার একমাত্র রাস্তা হল এখন রক্তবাহী শিরা। সেই শিরা দিয়ে জল দিতে হবে, খাদ্য দিতে হবে। তাতে ভদ্রলোক বাঁচতে পারেন, নাও বাঁচতে পারেন—নিশ্চিত কিছুই নয়।

তবে সে চেষ্টায় প্রচুর অর্থব্যয় হবে তাতে সন্দেহ নেই। আর তা বন্ধ করার উপায় হাসপাতাল।

'না হাসপাতাল নয়' সমস্বরে সবাই বলে ওঠে। ভোঁদড়ও বলে সে চেষ্টা করেছে, পারেনি। মিনি বলে তার বাবাকে আর বাইরে নিতে দেবে না। আর মিনির মায়ের নীরব মুখ বলে শেষ সময় পর্যন্ত উনি স্বামীর কাছে থাকতে পারলেই সুখী হন।

'আপনি করুন ডাক্তার বাবু। টাকা খরচ হলে ওঁরই টাকা খরচ হবে তা হোক। তাছাড়া মুখ দিয়ে উনি চড়ুই পাখী থেকে শুয়োর অবধি অনেক কিছুই তো খেয়েছেন। কিন্তু শিরা দিয়ে খাওয়াটা বাকি আছে। সেটাই বা বাকি থাকে কেন? চালান আপনি।'

ভোঁদড় তার কথা শেষ করে। তার মুখের মৃদু মিষ্টি হাসিটা কিন্তু লেগেই থাকে। সতু বদ্যি আবার বিরক্ত হয়।

তারপর শুরু হয় সতু বদ্যির লড়াই। শিরাপথে তিনদিন তিনরাত্রি জলযুদ্ধ। সতু বদ্যির কত অস্ত্র।

ভগ্নশর্করা গ্লুকোজ হয়ে এসেছে। খাদ্যপ্রাণ এ, বি, সি, ডি বোতলে করে এসেছে। জান্তব প্রোটিন ভেঙে এ্যামিনো অ্যাসিড হয়ে এসেছে—মানুষের রক্তের শ্বেত অংশ বোতলে করে এসেছে।

চতুর্থ দিন সকাল বেলা সতু বদ্যি মুখ তোলে। হ্যাঁ, মৃত্যুকে আপাতত পিছু হটিয়েছে সতু বদ্যি। চারশো টাকার বিনিময়ে অন্তত দিন আষ্টেকের জন্যে মৃত্যু হটেছে।

কিন্তু মৃত্যুর দুর্গ অক্ষত রয়েছে এখনও। পাকস্থলীর ভিত্তিমূলে সমস্ত খাদ্য সমস্ত পুষ্টির গতি অবরোধ করে দুর্গ এখনও সদর্পে বিরাজমান। সতু বদ্যির বক্তৃতা ব্যাহত হয় ভোঁদড়ের প্রশ্নে। উদ্বেগে কিন্তু তার মুখের মৃদু হাসিটা মিলিয়ে যায়নি। সতু বদ্যি বুঝতে পারে না ছেলেটার মনের ভাব। খুব চেষ্টাও সতু সদ্যি করে না। সোজাসুজি সাদা বাংলায় বোঝায়ঃ

উপায় একটি মাত্রই আছে। সে হল পেটের ভিতরে অস্ত্রোপচার করে ওই খাদ্যনালীর ফাঁস সরিয়ে দেয়া কিন্তু সে অপারেশন বেশ বড় আর দুরূহ। কোন হাসপাতালে কোন সার্জেনই হয়তো এ অপারেশন করতে চাইবেন না। কারণ প্রথমতঃ অপারেশনটা বড়, দ্বিতীয়তঃ রোগীর অবস্থা এত খারাপ যে অপারেশন টেবিলেই হয়তো রোগীর মৃত্যু হতে পারে আর তৃতীয়তঃ যদি ক্যান্সার হয় তাহলে অপারেশন সফল হলেও হয়তো অল্পদিন বাদেই রোগী মারা যাবে।

তবে হ্যাঁ সতু বদ্যি তার চেনাশোনা শল্যচিকিৎসাবিদ চিকিৎসকদের অনুরোধ করে এ চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সেও কোন নার্সিং হোমে করতে হবে। তার মানে প্রায় দেড় হাজার টাকা খরচ। কিন্তু তাতে রোগী বাঁচতেও পারে মরতেও পারে।

অত্যন্ত সোজা সরল বাংলায় সতু বদ্যি তার কথা শেষ করে। ভবিষ্যতে সে আর দোষের ভাগী হতে পারবে না। চিকিৎসক হিসাবে রোগীর জীবনের দৈর্ঘ্য একমুহূর্ত যদি দীর্ঘতর করা যায় সে চেষ্টা তার করা উচিত—তা বলে রোগী সারিয়ে সাঁতার শিখতে সতু বদ্যি আর রাজী নয়।

মাস্টারমশাই—হ্যাঁ, এর মধ্যেই সতু বক্সি রোগীকে মাস্টারমশাই বলে ডাকতে শুরু করেছে—মাস্টারমশাইয়ের সারা জীবনের সঞ্চয় সামনে দাঁড়িয়ে—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। তাঁদের ভিতরে পরামর্শ হয় দু-মিনিট।
'খরচ হবে তো কি আর করা যাবে।' ভোঁদড় এগিয়ে আসে আবার, 'পেটটা আপনি কাটিয়েই ফেলুন ডাক্তারবাবু। বুড়ো তো সারা জীবন হরেক রকম জিনিস খেয়েছে—এখন কোনটা যে আটকে বসে আছে দেখা যাক।'
ভোঁদড়ের মুখে সেই বিরক্তিকর মিষ্টি হাসিটি কিন্তু তখনও লেগে আছে।
সতু বক্সি বেরিয়ে যায় তখনই। অনেক কাজ। নার্সিং হোমে কেবিন ঠিক করতে হবে। শল্যচিকিৎসাবিদ ঠিক করতে হবে। দু-হাজার সি, সি, মানে প্রায় দু-সের রক্ত ঠিক করতে হবে—সব যন্ত্রপাতি ঠিক করতে হবে।
এ হল মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা। যুদ্ধের আগের মুহূর্তের সৈনিকের মত সতু বক্সি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সারাদিন পরিশ্রমের পর সতু বক্সি বিশ্রাম করছে চেম্বারে। সমস্ত বন্দোবস্ত সে করেছে। কলেজের পুরনো মাস্টারমশাইকে অনুরোধ করেছে ছাত্র হিসাবে। তিনি রাজী হয়েছেন—অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হয়েছেন অপারেশন করতে। নার্সিং হোম ঠিক করেছে। কিন্তু সব চাইতে অসুবিধা হয়েছে রক্তের বন্দোবস্ত করা। সতু বক্সি নিজে ঘুরেছে—বুড়ো, হাবলি, মিচকে আর গোপাল, হারু, দাশুদের কাছে। ভোঁদড় ঘুরেছে মাস্টার মশাইয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি—তারপর বন্দোবস্ত হয়েছে রক্তের।
সারাদিনের ধকলের পর তাইতে বিশ্রাম করছিল সতু বক্সি। কাল অপারেশন—কে জানে কি হবে।
হঠাৎ ঘরে ঢোকেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বেশ ভালো পোশাক-পরিচ্ছদে তার আর্থিক সাচ্ছল্য বোঝা যায়। বিশেষ কোন ভূমিকা না করেই তিনি কথা পাড়েন।
মাস্টার মশাই অর্থাৎ কিনা ওঁর ভাইঝি-জামাইয়ের অপারেশন উনি বন্ধ করে দিতে চান। ও বাড়ি থেকেই ইনি আসছেন। প্রথমতঃ, ওই স্বাস্থ্যের উপরে এত বড় ঝুঁকি নেয়া হোক উনি তা চান না। দ্বিতীয়তঃ, এই রোগী

যার মৃত্যু একরকম নিশ্চিত তার পিছনে তাঁর ভাইঝি আর নাতি-নাতনীরা যথাসর্বস্ব ব্যয় করুক এ তিনি চান না। প্রাণে রোগী মরবেই তখন ধনে-প্রাণে মরে কি আর বিশেষ কিছু লাভ হবে........।'

ভদ্রলোকের কথা শেষ না হতেই দরজা ঠেলে ভোঁদড় ঘরে ঢোকে। বিনা ভূমিকাতেই সে কথা পাড়ে ঃ

'দাদু এসে গেছেন ঠিক। অপারেশন হবে ডাক্তারবাবু। যদি এতে বাবার আয়ু দু-দিনও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলেও। আর দাদু আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন—টাকা আপনার ভাইঝি কিংবা নাতি-নাতনীর একটিও না সবই ওই বুড়োর। আর আমি যখন একুশ পেরিয়েছি তখন বিচারের অধিকার তো আমার আছে।'

ভোঁদড়ের মুখে তখনও সেই মৃদু মিষ্টি হাসি। কিন্তু খুব বিরক্তিকর নয়।

দাদু রেগেই বেরিয়ে যান। তাঁর চলমান গাড়ির পিছন দিকে তাকিয়ে ভোঁদড় হাসতে থাকে। বেশ চকচকে দামী গাড়ি।

অপারেশন শুরু হয় সকাল আটটায়। অপারেশন থিয়েটারের বিবরণ আপনারা নিশ্চয়ই অনেক শুনেছেন, দেখেছেনও হয়তো। কাঁচের ঘর আর চকচকে যন্ত্রপাতি, মুখোশ-পরা ডাক্তার আর চাদরে ঢাকা রোগী—এসবই নিশ্চয়ই আপনাদের জানা।

কিন্তু শল্যচিকিৎসকের মনের ভাব কি জানা? বিশেষ করে যেখানে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু আশঙ্কা করা হচ্ছে? যেখানে মুখোমুখি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই হচ্ছে? আর তা জানা থাকলেও সেই যুদ্ধের সেনাপতি সতু বক্সির মনের অবস্থা কি জানা?

অজ্ঞান করার সময় হয়তো চোখের সামনে ভেসে ওঠে অধ্যাপনার সময়কার আত্মবিশ্বাসী তেজস্বী মাস্টার মশাইয়ের মুখ, পেট খুলে দেখবার সময় হয়তো সামনে ভাসে মাস্টার মশাইয়ের সারা জীবনের সঞ্চয়—ভোঁদড় আর তার ভাই, মিনি আর তার মা।

আর যখন খোলা পেটের ভিতরে চোখের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে পাকস্থলীর বন্ধনের আসল রূপ? ক্যান্সার? তখন সতু বক্সির সামনে দাঁড়ায়—সার দিয়ে দাঁড়ায় মৃদু মিষ্টি হাসি মুখে ভোঁদড়, বিনুনী-দোলানো মিনি আর লাল পাড় শাড়ী পরনে, আর লাল সিঁদুরের টিপ কপালে মিনির মা। আর তাদের

পিছনে এসে দাঁড়ায় ভোঁদড়ের দাদু—তার মুখেও হাসি—না হাসি নয় ভ্যাংচানি।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে সতু বদ্যি বের হয় অপারেশন থিয়েটার থেকে। উদ্বিগ্ন আত্মীয়দের খবর দেয়, মাস্টারমশাই জীবিত অবস্থায়ই ফিরবেন অপারেশন থিয়েটার থেকে।

তিন দিন তিন রাত আবার যমে মানুষে লড়াই চলে। সতু বদ্যির খেয়াল থাকে না কোথা দিয়ে সময় যায়। চতুর্থ দিন সকালে সতু বদ্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বের হয় কেবিন থেকে। সামনেই দাঁড়িয়ে মাস্টার মশাইয়ের জীবনের সঞ্চয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। কোন ভূমিকা না করেই তাঁদের সামনে সতু বদ্যি আসল কথা খুলে বলে।

মাস্টার মশাইয়ের জীবন এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। পাকস্থলীর সঙ্গে তার নীচের অংশের যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসল রোগ ক্যান্সার তার কোন বিহিত করা হয়ওনি আর হওয়া সম্ভবও নয়। সুতরাং এ যাত্রা বেঁচে গেলেও ক্যান্সার থেকে তাঁর মৃত্যু অবধারিত। তাকে ঠেকাতে কেউই পারে না।

'ক্যান্সার ব্যাপারটা কি, ডাক্তারবাবু?' ভোঁদড়ের অদম্য কৌতূহল।

সতু বদ্যি ব্যাখ্যা করে ঃ

একটা সমাজ যেমন অনেক মানুষ দিয়ে তৈরি তেমনি বহু কোষ দিয়ে একটা দেহ তৈরি হয়েছে। সমাজের সব মানুষেরই যেমন সমাজের কাছে দায়িত্বও আছে আবার দাবিও আছে আর তাই বিচার করেই তার জীবধর্ম পালন করা বিধেয়—তেমনি জীবকোষেরও সমগ্র দেহের প্রতি দায়িত্বও আছে আবার দাবিও আছে আর তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই তার কোষধর্ম পালন করতে হয়।

এই ধর্মের ভিতরে আছে আহার অর্থাৎ পুষ্টি গ্রহণ করা; মলমূত্র ত্যাগ অর্থাৎ অব্যবহার্য দূষিত জিনিস বাইরে বার করে দেয়া। নতুন কোষের জন্ম দেয়া আর বেশী জীর্ণ হয়ে গেলে সমগ্র দেহের স্বার্থে মৃত্যু বরণ করা। এই রকম আরও অনেক।

এখন এই নতুন কোষের জন্ম দেয়া যদি শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি অসামঞ্জস্য হয় কিংবা সীমাহীন ভাবে এক বা একাধিক কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি

করতে থাকে তাহলে তাকেই বলে কর্কট রোগ বা ক্যান্সার। আর এই বৃদ্ধিশীল কোষদের সামঞ্জস্যহীনতার পরিমাণের উপরেই নির্ভর করে সমস্ত দেহের প্রতি তাদের বিষক্রিয়ার পরিমাণ।

সমাজের সঙ্গে তুলনা করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে আরও ভালো করে।

সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধন সংগ্রহ কিংবা সঞ্চয় করা যে কোন লোক তথা সমাজের সমগ্র স্বার্থের অনুকূল। কিন্তু কেউ যদি সমাজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়েই নিজের স্বার্থে নিজের ধনবৃদ্ধি কিংবা সঞ্চয় করতে থাকে তাহলে সে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরই হয়ে দাঁড়ায়। সে জমিদারই হোক আর মহাজনই হোক। আর তাদের বৃদ্ধির আর সামঞ্জস্যহীনতার পরিমাণের উপর তাদের সমগ্র সমাজদেহের উপর বিষক্রিয়ার পরিমাণও নির্ভর করে।

আর এই রকম লোকের বৃদ্ধি হলে যেমন একটা সমাজ ধ্বংস হতে পারে তেমনি এই রকম কোষের বৃদ্ধি হলে সমস্ত দেহই ধ্বংস হতে পারে।

বক্তৃতা শেষ করে সপ্তাহের পরিশ্রমকাতর সতু বক্সি টলতে টলতে বাড়ি ফিরে যায়।

মাস্টার মশাই নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরবার দিন সতু বক্সি মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে উপস্থিত ছিল।

মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী সেদিন এয়ো করলেন। তিনজন এয়ো। তাঁদের পান দিলেন, সুপুরি দিলেন। শাঁখা, সিঁদুর, নোয়া দিলেন, জল দিয়ে তাঁদের পা ধুইয়ে দিলেন, চুল দিয়ে তাঁদের ভেজা পা মুছিয়ে দিলেন। তারপর তাদের আশীর্বাদ নিয়ে স্বামীকে ঘরে তুললেন।

তারপর সতু বক্সি গিয়ে দাঁড়ালো মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রীর কাছে।

'ওঁরা কিছুই না করে এত পেলেন আর আমি এত করেছি আমি কিছু পাব না?' সতু বক্সির ন্যায্য দাবি।

সতু বক্সি কি পেয়েছিল জানেন? বলব? কাউকে বলবেন না কিন্তু। সতু বক্সি ভারী লজ্জা পাবে।

মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী করলেন কি—ওই দু-মন দশ সের পিপের মত ধেড়ে সতু বক্সির মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার থুতনিতে চুমু খেয়ে দিলেন। তারপর বললেন সতু বক্সি নাকি তাঁর ছেলের কাজ করেছে তাইতে এর চাইতে বড় আর কিছু তাঁর দেবার নেই।

আর সতু বত্তি কি করল জানেন? সে আরও লজ্জার কথা। দু-মন দশ সেরের ধেড়ে সতু বত্তি, মধুসূদন কবিরাজের বংশধর সতু বত্তি, পাড়ার ডাকসাইটে মাতব্বর সতু বত্তি—গড় হয়ে প্রণাম করলো ওই চাম দরিদ্দির স্কুল মাস্টারের কুসংস্কারের ডিপো, প্রৌঢ়া স্ত্রীকে।

মাস্টার মশাই মারা গেলেন দু-মাস পর। সতু বত্তির ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয়নি। কিন্তু তার শেষ চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফলই হল। ক্যান্সার-এর সামনে বিজ্ঞান নীরব দর্শক ছাড়া কিছুই নয়।
সতু বত্তিও তা জানত। কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট লিখবার পর রিক্তা, নিরাভরণা, মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রীর সামনে থেকে সতু বত্তি চোরের মতই পালিয়ে এসে ছিল।
মাস্টার মশাইয়ের গল্প এখানেই শেষ কিন্তু সতু বত্তির নয়।
মৃত্যুর এগার দিন পর নেমন্তন্ন সতু বত্তি আর সাঙ্গোপাঙ্গার। মাস্টারমশাই-এর শ্রাদ্ধ। ভোঁদড় কোন আপত্তিই শুনবে না। ভুলে গেলে সে রাত্তির বেলা এসে ডেকে নিয়ে যাবে। দেরি হলে সে অপেক্ষা করবে। যেতেই হবে সতু বত্তি আর সাঙ্গোপাঙ্গাকে আর শুধু গেলেই হবে না খেতেও হবে।
কিন্তু সতু বত্তি কি করে যাবে? কোন্ মুখে? মাস্টার মশাই ধনে-প্রাণে শেষ হয়েছেন ক্যান্সারে। তাঁর শেষ যাত্রার সারথি ছিল সতু বত্তি। সেখানে আজ সতু বত্তি কি করে মুখ দেখাবে?
কিন্তু উপায়? উপায় আর কি? সম্মুখ প্রদর্শন না করতে পারলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন। অর্থাৎ পলায়ন। আর ডাক্তার যখন—ছুতোর অভাব হবে না। বললেই হবে জরুরী রোগী ছিল।
সুতরাং সতু বত্তি আর সাঙ্গোপাঙ্গা দুজনেই বাড়ি ফেরে অনেক রাত্রে। কলকাতার নেমন্তন্ন সন্ধ্যা সাতটায়। সুতরাং সতু বত্তি বাড়ি ফেরে রাত এগারটায়। আস্তে আস্তে চোরের মত সতু বত্তি আর সাঙ্গোপাঙ্গা প্রায় দুপুর রাতে বাড়ি ফেরে।
কিন্তু পার পাবার উপায় নেই। ন্যাড়া মাথা ভোঁদড় ঠিক বসে আছে।
মা না খেয়ে বসে আছেন সতু বত্তির জন্যে। মা না খেলে ছেলেরাই বা কি করে খায়? তাইতে সবাই বসে আছে—সানুজ ভোঁদড় আর মিনি। না না খুব তাড়া করবার কিছু নেই। ডাক্তারবাবু তৈরি হয়ে নিতে পারেন।

এতক্ষণ যখন অপেক্ষা করেছে, আরও দশ মিনিট না হয় অপেক্ষা করবে ভোঁদড়।

সতু বদ্যি আর সাঙ্গোপাঙ্গা তখনই বেরিয়ে যায় ভোঁদড়ের সঙ্গে। সত্যিই লজ্জিত হয়েছে সতু বদ্যি। শ্রাদ্ধ বাড়ির ছাতে সতু বদ্যি আর সাঙ্গোপাঙ্গা পাশাপাশি বসে। মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী সামনে বসেন আর তাঁর দু-পাশে বসে সানুজ ভোঁদড় আর মিনি।

'খুব জরুরী রুগী ছিল বুঝি বাবা?' ভোঁদড়ের মা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার তো বাবা রুগীর কাছে গেলে আর আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকে না।'

'না তা নয়' সতু বদ্যি একদম সত্য কথা বলে। 'লজ্জায় আসতে পারছিলাম না। পালিয়ে ছিলাম তাইতে। আপনারা ধনে-প্রাণে শেষ হয়ে গেলেন—আর সে যাত্রার মাঝি হলুম আমি। এখন সেই শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খাই কোন্ মুখে?'

'ছি বাবা পালাবে কেন? তুমি তো আর কোন অন্যায় করোনি।' ভোঁদড়ের মা প্রতিবাদ করেন।

ভোঁদড় কিন্তু প্রতিবাদ করে না। সে বলে 'ডাক্তারবাবু একটা গল্প বলছি, খেতে খেতে শুনবেন?' বলে অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই গল্প বলা শুরু করে:

পুরনো গ্রীক পৌরাণিক গল্প। পুরাকালে একজন বিরাট পালোয়ান ছিলেন। তাঁর নাম ছিল থর। যার নাম থেকে বৃহস্পতিবারকে ওরা থার্স ডে বলে। তাঁর শারীরিক ক্ষমতার কথা ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই তাঁকে ভয় করেন।

শেষে একদিন দেবরাজ তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁর সভায় ডেকে পাঠালেন। থর তাঁর সভায় গেলে দেবরাজ প্রথমে তাঁকে দিলেন একটা পানপাত্র। দিয়ে বললেন 'পালোয়ান থর তুমি এই পানপাত্র খেয়ে শেষ করতে পারো?'

থর অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলেন পানপাত্রের পানীয় তিনি মাত্র এক চুল কমাতে পেরেছেন।

সভাসুদ্ধ সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

শেষে দেবরাজ বললেন 'বুঝেছি থর তোমার ক্ষমতা। ঐ যে বুড়োটা এগিয়ে চলেছে তাকে আটকাতে চেষ্টা করো তো।'

থর দেখলো তার সামনে দিয়ে চলেছে এক থুড়থুড়ে আদ্যিকালের বুড়ো। এত বুড়ো যে তার চুলগুলো যেন শনের নুড়ি। চলেছে কুঁজো হয়ে। কিন্তু তবুও চলেছে।

থর গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন। আপ্রাণ চেষ্টা করলেন বুড়োকে আটকাতে—কিন্তু মাত্র এক মুহূর্ত তারপরই বুড়ো তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলল।

পরাজিত অপমানিত থর বাড়ি ফিরছেন। সঙ্গে দেবরাজের দূত। সে থরকে বলল দেবরাজ ভীষণ ভয় পেয়েছে থরের ক্ষমতার পরিচয়ে।

থর প্রথমে ভাবল দূত হয়তো তাকে ঠাট্টা করছে। কিন্তু না দূত ঠিকই বলেছে। সে বুঝিয়ে বলল ঃ

এই যে পানপাত্র ওতে আছে সাতসমুদ্র—ওর সীমা এক চুলও যে কেউ কমাতে পারে তা দেবরাজ ভাবতেও পারেনি। কিন্তু থর তা পেরেছে।

আর ওই যে বুড়ো ও হল মহাকাল। ওর গতি এক মুহূর্তও কেউ যে রুখতে পারে তা দেবরাজ ভাবতেও পারেননি। কিন্তু থর তা পেরেছে। আর দেবরাজ তাইতে ভয় পেয়েছে। ক্যান্সারও তো ডাক্তারবাবু সেই মহাকাল। তার গতি যে আপনি ছ-মাসও রুখে দিয়েছিলেন সেটা কত বড় কথা। তাছাড়া আপনি তো ছ-মাসের জন্যে হলেও বাবার জীবন দিয়েছেন। টাকা? টাকার জন্যে কি হয়েছে? টাকা দিয়ে কি মানুষের জীবনের দাম মাপা যায়?' ভোঁদড় তার গল্প বলা শেষ করে। মুখে মৃদু মিষ্টি হাসি। সতু বক্সির ভারী মিষ্টি লাগে হাসিটা।

সতু বক্সির খাওয়াও শেষ হয়। ভারী তৃপ্তি হয় খেয়ে। একটা পান মুখে দিয়ে সাঙ্কোপাঞ্জাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়।

রাত প্রায় একটা হয়েছে। প্রশান্ত পরিতৃপ্তি নিয়ে সতু বক্সি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে।

বাঁদিকের ফ্ল্যাট থেকে চিৎকার ভেসে আসে। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের পশুর মত আর্ত চিৎকার। গম্ভীর গলায় প্রতিধ্বনিও আসে দোতলা থেকে। পুত্রের খেদ—আর কতদিন যে এ জ্বালাতন সইতে হবে কে জানে।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সতু বক্সি বলে সাঙ্কোপাঞ্জাকে ঃ

"মরতে যখন হবে তখন যদি এই মাস্টার মশাইয়ের মত মরতে পারি সাঙ্কো-পাঞ্জা।'

প্যায়দার শ্বশুরবাড়ি

স্টুল ইউরিন শিশি শিশি

মোর জীবনে গেল মিশি—ই—ই—

রে—এ—এ—

ওই 'রে'-টার উপরেই যত কারিকুরি, যত ওস্তাদী। এ–এ–এ–করে কত রকম কাজ যে করা যায় 'রে'-র উপরে।

ক্রিং—ক্রিং—কোন সাড়া নেই। সতু বদ্যি গান থামিয়ে আবার বেল বাজায়। নাঃ, কোন সাড়াই নেই। এতক্ষণে মনে পড়ে—তাই তো আজ রবিবার। বিকেলবেলা ওদের সবার ছুটি।

কিন্তু অভ্যাস এমনি জিনিস যে রবিবার জানা সত্ত্বেও সতু বদ্যি এতক্ষণ ধরে ক্রিং ক্রিং করেই চলেছে।

মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে যায়। অ্যাসেটিক এসিডটা যে কোথায় রেখে গিয়েছে—এখন আবার খুঁজতে হবে। কিন্তু না হলেই বা কি করে চলবে। প্রস্রাবে অ্যালবুমেন আছে কিনা না দেখে ওর চিকিৎসাই বা হয় কি করে?

আজ রবিবার। সতু বদ্যি কিছুদিন হল ঠিক করেছে—প্রত্যেক রবিবার বিকেলবেলা ছুটি নেবে। মানি মক্কেলদের মনোরঞ্জন করবে সারা সপ্তাহ, আর রবিবার দিন বিকেলে চার ঘণ্টা ধরে করবে বাড়ির লোকের মনোরঞ্জন। তাইতে সতুবদ্যি রবিবারে একেবারে কাকভোরে ঘুম থেকে ওঠে। ভোরবেলা ডাক্তারখানায় ঢোকবার আগে যতটা সম্ভব কাজ এগিয়ে রাখে, আর তারপর বেলা চারটে পর্যন্ত কাজ করে যদি সব কাজ শেষ করা যায় তাহলে ব্যস, ট্যাক্‌শি করে পাড়া ছেড়ে হাওয়া।

তারপর যা খুশি করো। হয়তো গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে, চীনে দোকানে খানা খেয়ে তারপর বায়োস্কোপ; আর না হয়তো শহর ছেড়ে সাত-আট মাইল দূরে গিয়ে গ্রামের ভিতরে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো। মোদ্দা কথা, যা খুশি করা। তখন আর কারো চাকর নয়।

এই রকম করবে ঠিক করেছে সতু বদ্যি। সারা জীবন, দিনরাত, চব্বিশ ঘণ্টা—

সারা মাস, বছর শুধু লোকের দুঃখের কথা শোনার কোন মানেই হয় না। জীবন তো আনন্দের জন্যেই। পৃথিবীর জীব, জন্তু, স্থাবর, জঙ্গম সবই জন্ম নেয় আনন্দে, আবার বিলীন হয় আনন্দেই।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

সুতরাং সপ্তাহে চার ঘণ্টাই হোক, আর দু-ঘণ্টাই হোক আনন্দ—শুধুমাত্র নির্মল নির্ভেজাল আনন্দের সন্ধানেই সতু বদ্যি বেরোবে। তখন আর রোগী নয়, রোগ নয়, শোক নয়, দুঃখ নয়, শহরের কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে—বহু দূরে—পলায়ন করাই তখন উদ্দেশ্য।

কিন্তু তা কি হবার যো আছে? ফি রবিবারেই একটা না একটা বখেড়া লেগেই থাকবে।

আজই ধরুন না। চারটে নাগাদ বাড়ি ফিরে স্নান করে, চা খেয়ে সাজগোজ করে সতু বদ্যি বেরোবে, আর অমনি এসে 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু'। কি? না ওঁর দিদি ফিট হচ্ছেন। দিদির আবার ছেলেপিলে হবে, সুতরাং ফিট হচ্ছেন শুনলে ছুটতেই হবে। এক্লেমসিয়াও হতে পারে, আবার হিস্টিরিয়াও হতে পারে। রোগী দেখে সতু বদ্যির হিস্টিরিয়া বলেই মনে হয়। গর্ভজনিত বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু তবুও প্রস্রাবটা একবার দেখা দরকার। প্রস্রাবে যদি অ্যালবুমেন না থাকে তাহলে সতু বদ্যি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বেরোতে পারে। কিন্তু সেও তো সব নিজেই করতে হবে। সাঙ্গোপাঙ্গারও আজ বিকেলে ছুটি। তাইতে সতু বদ্যি নিজেই ইউরিন খানিকটা নিয়ে টেস্ট টিউবে করে ফোটাচ্ছে আর গান করছে—

স্টুল ইউরিন শিশি শিশি
মোর জীবনে গেল মিশি—
ই—ই—ই—রে!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অ্যাসেটিক এসিড খুঁজেও পাওয়া যায় আর ইউরিনে অ্যালবুমেনও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সতু বদ্যি মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়। একটু দেরি হয়ে গেল বটে, সাতটা প্রায় বাজে। সতু বদ্যির স্ত্রী অর্থাৎ বদ্যি-গিন্নীর কাছে বায়োস্কোপের টিকিট করাই আছে। সাহেবপাড়ার বায়োস্কোপ। সাহেবপাড়া যেতে মিনিট দশেক, আর হোটেলে খেতে ঘণ্টা দেড়েক। তারপর ন-টায় সিনেমা শো। গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া আর হল না, তা নাই বা হল।

সতু বক্সি ডাক্তারখানা থেকে বেরোবে, ঠিক এমনি সময় তুটি মেয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে। না, তুটি মেয়ে নয়—একটি মেয়ে আর একটি বউ। বউটির বয়স বছর সতের-আঠারো আর মেয়েটির বয়স বছর তের-চোদ্দ। ননদ আর ভাজ। ভাজের কোলে একটি বছর খানেকের বাচ্চা।
'ডাক্তারবাবু, দেখুন আমার ছেলের জ্বর হয়েছে।'
কথা বলতে বলতেই মা আর পিসী ঘরে ঢোকে।
'রবিবারে বিকেলে আমি কিন্তু রুগী দেখিনে' বলে সতু বক্সি ওদের চিনতে পারে। প্রায় তু-মাইল দূর থেকে এসেছে সতু বক্সিকে রুগী দেখাতে। সুতরাং সতু বক্সি আবার বলে 'আজ যখন এসেছেন তখন দেখছি, কিন্তু এর পরে আর রবিবার বিকেলে আসবেন না।'
কতক্ষণ আর সময় লাগবে? বড় জোর দশ মিনিট। সতু বক্সি চটপট কাজে লেগে যায়। নাঃ, তেমন কিছু হয়নি—সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা। বাচ্চার মাও তো নতুন মা হয়েছে, তাইতে একটু ভয় পেয়েছে। ব্যবস্থাপত্র লেখা আর বুঝিয়ে দেয়া দশ মিনিটের ভিতরেই হয়ে যায়।
বাইরে বেরিয়ে সতু বক্সি দরজায় তালা দেবে, এর ভিতরে ওপাড়ার কেলে আসে হন্তদন্ত হয়ে। তার হাতে একটা শালপাতার ঠোঙ্গা।
'শিগ্‌গির শিগ্‌গির দরজা খুলুন ডাক্তারবাবু। ওখানে মাংসের সিঙ্গাড়া ভাজছে। চারটে কিনে নিয়ে এসেছি—তুটো আপনার, তুটো আমার।'
সতু বক্সি একটু বিরক্ত হয়। কিন্তু অনুরোধ ফেলতে পারে না। পাড়ার দোকান 'ইণ্টারন্যাশনাল ফ্রেণ্ডস কাফে' ওই বস্তিরই একটা ঘরে। সেখানে কিমা দিয়ে সিঙ্গাড়া বানিয়েছে। কবে হয়তো সতু বক্সি বলেছে মাংসের সিঙ্গাড়া ভালোবাসে—তাই তো গরম মাংসের সিঙ্গাড়া নিয়ে এসেছে ছুটতে ছুটতে।
সতু বক্সি সবে একটা মাংসের সিঙ্গাড়া মুখে দিয়েছে, অমনি কোথা থেকে প্যাংলা এসে জুটল। এসেই কথা নেই বার্তা নেই, একটা সিঙ্গাড়া তুলে সোজা মুখে।
কেলে প্যাংলাকে এই মারি কি এই মারি করে তাড়া করে যায়—'আচ্ছা উল্লুক তো! আমি নিয়ে এলুম ডাক্তারবাবুর জন্যে, আর তুই কিনা জিজ্ঞেস নেই বাদ নেই, সোজা মুখে পুরে দিলি!'
'তাতে আর কি হয়েছে'—অম্লানবদনে প্যাংলা জবাব দেয়। 'ডাক্তারবাবুও খেলেন, আমিও খেলুম।'

'না না, উল্লুক নয়'—সতু বত্তি গম্ভীরভাবে কেলোকে শুধরে দেয়—'প্যাংলা হল আসলে হ্যাংলা। ওই ভূতো আছে, সেই যে বাজারে ফল বিক্রি করে? সে কাল দুটো ল্যাংড়া আম দিয়ে গেল। সে নাকি আসল বেনারসী দুধিয়া ল্যাংড়া। প্যাংলাটা ঠিক কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে না ধুয়ে একটার পিছনে এক কামড়। ভূতো বেচারা কেঁদে ফেলে আর কি!'

প্যাংলা কিন্তু একটুও লজ্জিত হয় না, বোকার মত হি হি করে হাসতে থাকে।

এর মাঝে হঠাৎ ওই বউটি ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ডাক্তারবাবু এখুনি আসুন আমার খোকা নীল হয়ে গিয়েছে।' এই ক-মিনিটের উদ্বেগ আর উত্তেজনায় মেয়েটির চেহারাই বদলে গিয়েছে।

'প্যাংলা—ডাক্তারখানা পাহারা দিও' সতু বত্তি ব্যাগ নিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যায় বাস-রাস্তার দিকে।

হ্যাঁ, পিসীর কোলে বাচ্চাটা রয়েছে। আর পিসীর চারদিকে একটা ক্ষুদ্র ভিড় জমে উঠেছে। বাচ্চাটার চোখদুটো উপর দিকে উঠে স্থির হয়ে রয়েছে। হাত দুটো মুঠো করা শক্ত। নিশ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা বোঝা যায় না। ভিড়ের ভিতরে কেউ জল দিচ্ছে ওর চোখেমুখে, কেউ জল দিচ্ছে ওর মাথায়, কেউ হাত টানছে, কেউ পা টানছে, একটা হৈ হৈ ব্যাপার।

ভিড় ঠেলে সতু বত্তি ঢোকে, ঢুকে বুঝতে পারে। জাত বত্তি তো, ভুল হয় না। বাচ্চাদের যে তড়কা হয়—এ সেই তড়কা। অনেক বাচ্চারই হয়। একটু বেশী জ্বর হল আর হয়তো ফিট হয়ে গেল। মায়েরা বিশেষ করে কমবয়সী হলে এতে খুবই ভয় পায়। ভয় যে পাবার কারণ নেই তা নয়। এ অবস্থায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে দু-একটা বাচ্চা মারাও গিয়েছে। তবে এদের চিকিৎসা জল দেয়া নয়। এদের চিকিৎসা হল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া।

বাচ্চাকে কোলে নিয়ে সতু বত্তি আর বাচ্চার মা রিক্সা করে ডাক্তারখানায় ফেরে—আর পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে ফেরে বাচ্চার পিসী। ডাক্তারখানায় ফিরে এসে ব্যাগ খুলে আবার দেখে ব্যাগে লুমিনাল নেই। 'প্যাংলা—' সতু বত্তি হাঁক দেয়, 'যাও দৌড়ে যাও, ঘড়ি খুলে বসে আছি। তিন মিনিটের ভিতরে ইন্‌জেকশনটা চাই।'

প্যাংলা ছোটে—তিন মিনিট নয় আড়াই মিনিটেই ইন্‌জেকশন এনে হাজির করে।

উঃ বাচ্চাটা কী জ্বালাতন যে করে। একটি ঘণ্টা লাগে ফিট ছাড়াতে। ইন্‌জেকশন দেয়া, ওষুধ দেয়া, কত কাণ্ড যে করতে হয়।

আর শুধু কি বাচ্চার ফিট? মা-পিসীও চেঁচায় সমানে পাল্লা দিয়ে। সতু বদ্যি মাঝে মাঝে ধমকে ওঠে। তাতে হয়তো থামে দু-চার মিনিট তারপর আবার শুরু করে চেঁচামেচি।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটার ফিট ছেড়ে যায়। বেশ আরামে ঘুমোতে থাকে মায়ের কোলে। সতু বদ্যিও নিশ্চিন্ত হয়।

এইবার আবার ট্যাক্‌শি ডাকতে হবে। তাছাড়া এদের বাড়ি পাঠাবে কি করে?

'প্যাংলা—মোড় থেকে একটা ট্যাক্‌শি ধরে আনো তো', সতু বদ্যি আবার হাঁক দেয়।

প্যাংলা আবার বেরিয়ে যায়। পাঁচ মিনিটের ভিতরেই আবার ফিরে আসে ট্যাক্‌শি নিয়ে। প্যাংলা হ্যাংলা হতে পারে কিন্তু চটপটে আছে।

আবার সমস্যা।—অসুস্থ বাচ্চা আর তার মা আর পিসী—তারাও বাচ্চাই, তাদের সঙ্গে কোন দায়িত্বশীল লোক না দিয়ে সতু বদ্যি ছেড়ে দেয় কি করে? সাঙ্গোপাঙ্গাও নেই। রবিবারে তার ছুটি। সতু বদ্যিরও বেরোতে হবে। স্ত্রী অর্থাৎ বদ্যি-গিন্নীর সঙ্গে। সুতরাং 'প্যাংলা........'

প্যাংলা হাজির।

'ওঁদের সঙ্গে ট্যাক্‌শি করে যাবে। ওঁদের একেবারে ঘরের ভিতরে পৌঁছে বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে তারপর তোমার ছুটি।'

প্যাংলা গাড়িতে ওঠে।

মা গাড়িতে ওঠে। পিসী গাড়িতে ওঠে। বাচ্চা গাড়িতে ওঠে। বাচ্চাটা ঘুমোয়। মা আর পিসী তাকায় সতু বদ্যির দিকে। জাত বদ্যি তো, চোখ দু-জোড়া দেখে বুঝতে পারে। চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, আশীর্বাদ, ভালবাসা।

গাড়িটা স্টার্ট দেয়। হঠাৎ প্যাংলা চেঁচিয়ে ওঠে 'ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তার বাবু........দু-আনা পয়সা দিন তাছাড়া ফিরব কি করে?'

'হুঁ' সতু বদ্যি অম্লানবদনে বলে 'দু-আনা পয়সা দেব না ছাই দেব।

ইন্‌জেকশন কেনা আর ট্যাক্‌শি আনা হল সিঙ্গাড়ার দাম—আর হেঁটে বাড়ি ফেরা ল্যাংড়া আমের দাম।'

প্যাংলা তাকিয়ে থাকে, গাড়ি এগিয়ে যায়। সতু বক্সি প্যাংলার চোখদুটো দেখে। বোকা বনে গিয়েছে ছোক্‌রা। কিন্তু রাগ দ্বেষ নেই ওর দৃষ্টিতে। জাত বক্সি বুঝতে পারে। ঠিক পৌঁছে দিয়ে আসবে প্যাংলা। দরকার হলে হেঁটেই ফিরবে। কিন্তু বাস ভাড়া নেই বলে ট্যাক্‌শি থামিয়ে পালাবে না।

আশেপাশে হাসতে থাকে কেলে আর ভোঁদড়। মিচকে আর বড়কু।

সতু বক্সি ঘড়ি দেখে। নটা বাজে। সুতরাং গড়ের মাঠও হল না। চীনে হোটেলও না। সিনেমাও না। বক্সি-গিন্নী সতু বক্সিকে আজ নেবে এক হাত।

প্রবলপ্রতাপ সতু বক্সি ভীত হয়ে ওঠে।

চোখ তুলতেই সামনে নজরে পড়ে বক্সি-গিন্নী দাঁড়িয়ে আছে। বক্সি-গিন্নীর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরছে।

উঃ, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই কি সন্ধ্যা হবে।

'আর কি ? যাই এবার রান্না চাপাই কি বল ? চীনে হোটেলে তো খুব খাওয়ালে।'

বক্সি-গিন্নীর কথা তো যেন আগুন।

'তাই যাও' ভয়ে ভয়ে সতু বক্সি বলে।

'আচ্ছা বলতো ?' বক্সি-গিন্নী কাছে এগিয়ে আসে, 'বলতে পারো ? সারা দিন সারা সপ্তাহ, মাস বছর এই টাকা টাকা করে তোমার লাভ কি হয় ? জীবনে একটু আনন্দে বিশ্বাস করো না ? জীবনকে একটু ভোগ করাকেও কি বিশ্বাস করো না তুমি ? তুমি কি মানুষ ? না টাকা তৈরির যন্ত্র।'

বক্সি-গিন্নীর জিহ্বায় ক্ষুরের ধার।

হ্যাঁ, অন্যায় সতু বক্সির সত্যিই হয়েছে। বেচারা বিকেল থেকে সাজগোজ করে অপেক্ষা করছে আর সতু বক্সি কি না খালি রুগী দেখছে।

তবে সতু বক্সি আনন্দে বিশ্বাস করে না—এ অভিযোগ মিথ্যা। সতু বক্সি আনন্দে শুধু বিশ্বাস করে তাই নয়, সতু বক্সি বিশ্বাস করে ঃ

> "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বি মানি ভূতানি জায়ন্তে
> আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
> আনন্দং প্রয়ন্তভিসংবিশন্তীতি।"

আনন্দ থেকেই সর্বভূতের উৎপত্তি। তারা আনন্দেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাদের গতি আনন্দের দিকে। আবার তারা বিলীনও হয় আনন্দেই।

কিন্তু সতু বক্সি কি করে নিজেকে রক্ষা করে বক্সি-গিন্নীর আক্রমণ থেকে?

তবে দমবার পাত্র সতু বক্সি নয়।

তাইতে সতু বক্সি খুব আস্তে আস্তে বলে—

'আনন্দে বিশ্বাস করি বৈ কি বক্সি-গিন্নী? তবে কি জানো? ওই মা পিসী ওদের চোখে আনন্দ। কেলের সিঙ্গাড়া তাতেও আনন্দ। আর প্যাংলার ছুটো-ছুটি তাতেও আনন্দ। আবার চীনে হোটেল আর সাহেবী বায়োস্কোপেও আনন্দ। কোন্‌টা যে বেছে নিই সেইটেই হল সমস্যা। বাঁশবনে ডোমকানা হয়ে গিয়েছি আসলে।'

খুব আস্তে ভয়ে ভয়ে তাকায়। সতু বক্সি এইবার একটু ভরসা পায়। বক্সি-গিন্নীর চাউনিটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছে।

তালাবন্ধ করে সতু বক্সি আর বক্সি-গিন্নী রওনা হয় বাড়ির দিকে।

ভরসা পেয়ে সতু বক্সি আবার গান ধরে—গুনগুনিয়ে।

স্টুল ইউরিন শিশি শিশি
মোর জীবনে গেল মিশি—ই ই-রে-এ-এ

ঐ 'রে'-টার উপরেই যত ওস্তাদী।